আগস্ট দ্বিতীয় পক্ষ ২০২১ ■ ভাদ্র ১৪২৮

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

আগস্ট মাস শোকের মাস

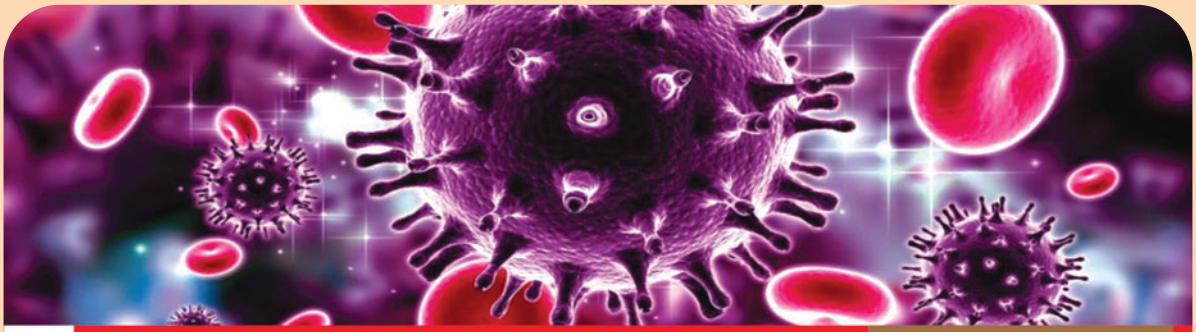

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

আগস্ট দ্বিতীয় পক্ষ ২০২১ ⌟ ভাদ্র ১৪২৮

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকীতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মোনাজাত করেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশী হয়ে সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য ১৯৭৫ সালের এই দিন ভোরবেলায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে এনে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করার স্বপ্নও দেখেছিলেন তিনি। তাঁর নেতৃত্বে যখন বাংলাদেশ এগিয়ে চলছিল তখন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘটে এই কলঙ্কজনক ঘটনা। এই দিন ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধুর পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল, রোজী জামাল, কনিষ্ঠপুত্র শিশু শেখ রাসেলকেও তারা হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর ছোটো ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর ছেলে আরিফ, মেয়ে বেবি ও সুকান্ত বাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী শেখ আরজু মণি ও কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও ঘনিষ্ঠজন এ নিষ্ঠুর, বর্বর হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এসময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যবর্গের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। ঘাতকদের যথাযোগ্য শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে বাঙালিকে এই কলঙ্কের বোঝা থেকে মুক্ত হতে হবে। জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী ১২ই ভাদ্র। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩) তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের জন্য প্রতিবাদ করেন। কবিতা, গল্প, ছড়া, উপন্যাস, নাটক, গানসহ বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে ছিল কবি নজরুলের অবাধ বিচরণ। বাংলা ভাষাকে তিনি করেছেন ঋদ্ধ। এ সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* আগস্ট দ্বিতীয় পক্ষ সংখ্যা। আশা করি, এ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

সিরাজ-উদ-দৌলা থেকে বঙ্গবন্ধু: ১৫ই আগস্টের ট্র্যাজেডি ৪
প্রফেসর ড. মো. এমরান জাহান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: জানা-অজানা কথকতা ৮
প্রফেসর ড. শেখ রেজাউল করিম

বঙ্গবন্ধুর *Amgvß AvZ¥Rxebx:* তুলনামূলক পাঠ ১০
ড. মোহাম্মদ হাননান

নজরুলের প্রথম লেখাপ্রকাশ এবং আজকের বাংলাদেশ ১৩
প্রফেসর ড. সৌমিত্র শেখর

বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা ও জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড: একটি পর্যালোচনা ১৭
ড. মো. আব্দুস সামাদ

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আমাদের প্রাপ্তি ২০
ড. আফরোজা পারভীন

জীবিতের চেয়েও অধিক জীবিত তুমি ২৪
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ২৮
শামীমা চৌধুরী

পনেরোই আগস্ট: জাতীয় শোক দিবস পালন ৩১

নজরুল জীবনে নয় সংখ্যার বিস্ময়কর সমীকরণ ৩৪
মনজুর-ই-আলম ফিরোজী

আধুনিক রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবের মহাপ্রয়াণ ৩৬
রহিম আব্দুর রহিম

চিরভাস্বর বঙ্গবন্ধু ৩৮
কে সি বি তপু

করোনা মহামারিতে সরকারের কার্যক্রম ৪০
জুয়েল মোমিন

গল্প

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের পায়রাগুলো ৪২
জসীম আল ফাহিম

কবিতাগুচ্ছ ৪৪-৪৮

কামাল চৌধুরী, অতনু তিয়াস, সোহরাব পাশা, মো. আফরাজুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, সত্যজিৎ বিশ্বাস, চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু, প্রণব মজুমদার, সিরাজউদ্দিন আহমেদ, জাফরুল আহসান, আনসার আনন্দ, মো. মোস্তাফিজুর রহমান, আতিক আজিজ, রোকেয়া ইসলাম, ইমরান পরশ, বোরহান মাসুদ, শামছুন নাহার, এম ইব্রাহীম মিজি, ফরিদ আহমেদ হৃদয়, সেহাঙ্গল বিপ্লব, সুজিত হালদার, আবীর আহম্মদ উল্যাহ, ওয়াসীম হক

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৯
প্রধানমন্ত্রী ৫০
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫১
আন্তর্জাতিক ৫২
উন্নয়ন ৫২
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৩
শিল্প-বাণিজ্য ৫৩
শিক্ষা ৫৪
বিনিয়োগ ৫৪
নারী ৫৫
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৫
কৃষি ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
বিদ্যুৎ ৫৭
নিরাপদ সড়ক ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৮
যোগাযোগ ৫৯
কর্মসংস্থান ৬০
সংস্কৃতি ৬০
চলচ্চিত্র ৬১
মাদক প্রতিরোধ ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬২
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬২
প্রতিবন্ধী ৬২
ক্রীড়া ৬৩
শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন একাত্তরের গণহত্যার সাক্ষী বাংলাদেশের বন্ধু জোসেফ গ্যালোওয়ে ৬৪

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

আগস্ট মাস শোকের মাস | শোক থেকে শক্তি– | শোক থেকে জাগরণ–

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গভীর ভালোবাসা ও আপোশহীন নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয়, রাজনৈতিক জীবনেও সকল ক্ষেত্রে পরামর্শ, সাহস, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা করেছেন। বঙ্গবন্ধু যখন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্য কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা সপরিবার শহিদ হন। বিদেশে থাকায় বেঁচে যান তাঁদের দুই কন্যা– বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। আগস্ট মাস শোকের মাস। তিনি নেই কিন্তু বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে তাঁর স্পর্শ ও আদর্শ। তিনিই আমাদের পাথেয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতীয় কবির মর্যাদায় বিভূষিত করেন। কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর লেখনীতে সাম্য, সম্প্রীতি, মানবতা ও প্রেমপ্রীতির সুরধ্বনির সঙ্গে ফুটে উঠেছে অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার, শাসন-শোষণ-অনাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। তাঁর কবিতা ও গান ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ১২ই ভাদ্র জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৫তম প্রয়াণ দিবস।

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ এবং পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন বিষয়ে প্রতিবেদন দেখুন, পৃষ্ঠা ৪-৩৯

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

সিরাজ-উদ-দৌলা থেকে বঙ্গবন্ধু
১৫ই আগস্টের ট্র্যাজেডি

প্রফেসর ড. মো. এমরান জাহান

উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পশ্চাতে ছিল বাঙালির দীর্ঘদিনের আত্মানুসন্ধান, যুগযুগান্তরের মুক্তিসংগ্রাম ও আত্মত্যাগের অমোঘ এক পরিণতি। সেই সুদূর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টাব্দের দ্বাদশ শতক অবধি বাংলা উপদ্বীপে (বেঙ্গল ডেল্টা) খণ্ডিতভাবে মৌর্য, গুপ্ত, পাল এবং সরল-সহজ বাঙালি সমাজে কট্টর জাতপাতের পৃষ্ঠপোষক সেন রাজাদের শাসন চলেছে। তেরো শতকের প্রারম্ভে বাংলায় নতুন এক শাসনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। সে নতুন শাসন মুসলিম সুলতানি যুগের শাসনকাল। সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮)* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, স্বাধীন সুলতানদের দুশো বছর শাসনকাল ছিল ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ গঠনের যাত্রাপথে একটি মাইলফলক। সুলতানদের মধ্যে শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২১) বঙ্গ অঞ্চলকে সর্বপ্রথম একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রতিষ্ঠা করেন। আর সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ যিনি প্রকৃত অর্থে স্বাধীন বৃহৎ বঙ্গ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন, তাঁর এই রাষ্ট্রই 'শাহি বাঙালা' নামে পরিচিত। তিনিই বাঙালা নামের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান 'সুলতান-ই-বাঙালা'। এ ধারা ১৫৩৮ সময়কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতঃপর দিল্লির মোগল শাসন বাংলাকে গ্রাস করে। সে যুগ পার করে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন নবাবি শাসন। তাও কপালে বেশি দিন সইল না নতুন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সীমাহীন লোভের তাণ্ডবে। ভেবে আত্মচকিত হই, কীভাবে একদল ইংরেজ বণিক দল ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বাংলাকে পদানত করে, আরেক বিশ্বাসঘাতক দেশীয় অমাত্য ও অতিলোভী স্থানীয় বণিকদের মিলিত চক্রান্তে। সেদিনও দেশি-বিদেশি মিতালি চক্রান্তের জালে আটকা পড়ে ভাগীরথীর তীরে পলাশীতে নবাবি বাংলার স্বাধীনতা বিলীন হয়। আর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। অতঃপর আবার নানা সংগ্রাম-আন্দোলন ও রক্তবন্যার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় দুঃখিনী বাংলা। এবার বাংলার মানুষকে নতুন এক রাষ্ট্র সৃষ্টির স্বপ্ন নিয়ে জাগরিত করেন টুঙ্গিপাড়া থেকে আগত শেখ মুজিবুর রহমান। সেই শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ থেকে সিরাজ-উদ-দৌলা হয়ে স্বপ্নের কাঠি নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির প্রাণে জাতীয়তাবাদের এক প্রবল স্রোতোধারা সৃষ্টি করেন। 'রাজনীতির কবি' হয়ে পূর্ব পাকিস্তান নামক বাংলা ভূখণ্ডটিকে 'বাংলাদেশ' বলে ঘোষণা করেন শেখ মুজিবুর রহমান। সেই শাহি বাঙালা থেকে নিজস্ব স্বাধীন জাতিসত্তার বাংলাদেশ। বাঙালির ঐক্যমঞ্চে শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর সীমাহীন ত্যাগ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জন্ম নেয় আজকের বাংলাদেশ। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পরে হারানো বাঙালাকে অর্থাৎ বাঙালি জাতিসত্তাকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত করেন বঙ্গবন্ধু। তাই ইতিহাস-ই শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশটির 'পিতা' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে নিঃসংকোচে, নির্বিবাদে। তিনি আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতির পিতা।

বঙ্গ, শাহি বাঙালা, বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান থেকে অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশ পেলাম আমরা। দেশ জননী আর জন্মভূমি পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন জাতির পিতা। এবার এক কঠিন দায়িত্ব, অন্তহীন সমস্যা যত্রতত্র। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সমস্যা আড়ালে ওতপেতে আছে অদৃশ্য এক শত্রু, যারা স্বাধীন বাংলাদেশকে গ্রহণ করতে পারেনি। গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর তীরে মুর্শিদাবাদের স্বাধীন তরুণ নবাব যেভাবে আটকা পড়েছিলেন ঘরে-বাইরের চক্রান্তের জালে, অনুরূপ বুড়িগঙ্গার তীরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকেও মোকাবিলা করতে হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি ঘরে-বাইরের শত্রুকে।

প্রাণান্তকর প্রয়াসে জাতির পিতা মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে তৈরি করলেন বহুকাঙ্ক্ষিত উত্তম একটি শাসনতন্ত্র, সময়ের পূর্বে সম্পন্ন করলেন জাতীয় নির্বাচন, প্রণয়ন করলেন জাতীয় শিক্ষানীতি। কিন্তু একাত্তরকে মেনে না নেওয়া অপশক্তি তখনো বিশ্বময় প্রচার করে যাচ্ছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যত প্রচারণা। তাদেরই মিলিত চক্রান্তে পলাশীর বাংলার রাজ্যাকাশে পুনরাবৃত্তি ঘটে আরেক পলাশীর। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী সদস্যের উন্মত্ত আক্রমণে প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হন। রাজনীতির পর্দার আড়াল থেকে রক্তাক্ত হাত নিয়ে বঙ্গভবনের মঞ্চে হাজির হয় বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহচর খোন্দকার মোশতাক আহমদ। অবিশ্বাস্যভাবে রক্তাক্ত দিনটি পার না হতেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে আগামসি লেন থেকে বঙ্গভবনে যাত্রা করেন বিশ্বাসঘাতক খোন্দকার মোশতাক আহমদ। ভাবতে কষ্ট হয়, তখনো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহটি পড়ে আছে অবহেলিত অবস্থায় তাঁর লালিত বাসভবনের মোজাইক করা সিঁড়িতে। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, খোন্দকার মোশতাক আহমদ একদিন পূর্বেও বঙ্গবন্ধু সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। আরও পীড়াদায়ক বিষয় হলো, বঙ্গবন্ধুর উপরাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহ স্বপদে বহাল থাকেন এবং একই স্রোতোধারায়

বঙ্গবন্ধু সরকারের ১৬ জন মন্ত্রী বিশ্বাসঘাতক মোশতাক সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন স্বাচ্ছন্দ্যে। সশস্ত্রবাহিনীর তৎকালীন প্রধান ও উপপ্রধান সিপাহসালার যথাক্রমে মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানসহ জল, স্থল ও আকাশ বাহিনীর প্রধানগণ নতুন সরকারের প্রতি প্রকাশ করেন নির্বিবাদে সকল আনুগত্য। কৌতূহলের বিষয়, গুটিকয়েক অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল মেজরের সকল তাণ্ডবকাণ্ড অসহায়ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখলেন জাদরেল জেনারেলগণ। কেউ মেনে নিলেন, কেউবা মৌনতা অবলম্বন করলেন। সবাই আছে মঞ্চে, শুধু নেই একজন, তিনি বাঙালির স্বাধীন জাতিসত্তার নির্মাতা শেখ মুজিবুর রহমান। পরিহাসের বিষয়, ঢাকার এই নারকীয় ও বিচিত্র ঘটনা যেন ১৭৫৭ সালের মুর্শিদাবাদের ঘটনার-ই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মৃতদেহটি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে মুর্শিদাবাদের রাজপথ যখন ঘুরছিল, সে সময়টায় নবাবের একান্ত আপনজন প্রধান সিপাহসালার মীর জাফর আলী খাঁ মুনসুরাবাদের প্রাসাদে নবাবি আসনে বসে বিশ্বাসঘাতকদের তোষামোদি করছিল। সেসময়ের মুর্শিদাবাদের উজির অমাত্য কেউ মৃতদেহটিকে রাজকীয় মর্যাদায় ইজ্জত দিতে এগিয়ে এল না। কিন্তু ইতিহাস নামক জায়গাটা বড়োই বাস্তব, ইতিহাসই নির্ণয় করে কে কোথায় স্থান পাবে। আজও কোথায় মীর জাফর আলী খাঁ, জগত শেঠ, ঘষেটি বেগম আর ক্লাইভ ? একইভাবে খোন্দকার মোশতাক এবং খুনি মেজররা ও সেসময়ের কুশীলবগণ আজ ঘরে ঘরে নিন্দিত, ঘৃণিত। বাংলার এই দুই বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করেনি ইতিহাস, ক্ষমা করবে না বাঙালি জনতা।

দুই

শেখ মুজিবুর রহমান শুধু রাষ্ট্রপতিই ছিলেন না। তিনি নতুন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা। যার হাত ধরে মাত্র চার বছর পূর্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি ও তাঁর পরিবার নৃশংসভাবে নিহত হলেন। কিন্তু এখনো ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মধ্যে প্রশ্ন ঘুরপাক খায়, এত বড়ো একজন জনপ্রিয় নেতা নিহত হলেন, তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে নারকীয়ভাবে হত্যা করা হলো, কিন্তু সেসময়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে নৃশংসতার ঘাতকদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কোনো প্রতিবাদ হয়নি কেন? কেন ঢাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। এ সকল নীরবতা আধুনিক ইতিহাসে এক বিস্ময়ের ব্যাপার। বঙ্গবন্ধু হত্যার কারণ ও বিস্ময়কর ঘটনাবলির অগ্র–পশ্চাৎ নিয়ে দেশে হালে প্রচুর গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। কিন্তু এগুলো অধিকই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, নয়তো চর্বিতচর্বণ আর স্তুতি পর্যায়েই পড়ে। বিদেশে কিছু মৌলিক গবেষণা হয়েছে। তবে সে মতামত ও আলোচনাও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের আলোচিত *A Legacy of Blood* এমনি একটি গ্রন্থ। সে গ্রন্থে ঘাতক খুনিদের কিছু ভাষ্য পাওয়া যায়, কেন তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে খুনিরা বিভিন্ন বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন তথ্য ও মন্তব্য উপস্থাপন করেন, যা তাদের মনগড়া– যাতে তাদের অবৈধ কৃতকর্মকে বৈধতা দেয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আত্মস্বীকৃত ঘাতক সেনা কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের মন্তব্যের মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে তাতে সন্দেহ নেই। তারা জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পক্ষে এবং সরকার পরিবর্তনের পক্ষে সাফাই গাইবেন তা খুবই স্বাভাবিক। খুনিদের বিভিন্ন সময়ের দম্ভোক্তি সাক্ষাৎকারে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মূল ঘটনাকে আড়াল করা ছাড়া কিছুই ছিল না। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড ছিল বহুমাত্রিকতায় ভরপুর। এর কিছু তথ্য উপাত্ত হাজির করেছেন অধ্যাপক আবু সাইয়িদ তাঁর *ফ্যাক্টস্ এন্ড ডকুমেন্টস্ : বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড* গ্রন্থে। হালে প্রকাশিত বিভিন্ন দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং সেনা অভ্যুত্থানের পেছনে অভ্যন্তরীণ কারণ ছিল উপলক্ষ মাত্র। সেদিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তালুকদার মনিরুজ্জামানের *Group Interest And Political Changes in Bangladeh* গ্রন্থটি অধিক বস্তুনিষ্ঠ। এছাড়া মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ তাঁর *Bangladesh : Unfinished Revolution* গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে বঙ্গবন্ধুর খুনিচক্র মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিল। এখানে ১৭৫৭ সালের পট পরিবর্তনের সঙ্গে ১৯৭৫ সাল পরবর্তী বিকৃত ইতিহাস চর্চার একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধ এবং বাংলার বৈধ শাসক নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার হত্যাকাণ্ড জায়েজ ও বৈধকরণের জন্য দেশীয় বুদ্ধিজীবী ও লেখকগণ প্রচুর গ্রন্থাদি রচনা করেন। আর এই লেখকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নতুন শাসকগোষ্ঠী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এদের হাত ধরে সমসাময়িক ইংরেজ লেখকরা গ্রন্থ রচনায় দেখান যে, নবাব সিরাজ ছিলেন লম্পট, নারী নির্যাতনকারী। অতএব, তাঁকে উৎখাত করার জন্য পলাশী যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল। এই বিকৃত ধারা চলছিল প্রায় ১৯০ বছর। ১৭৫৭ থেকে ১৯৭৫ সময়ের ব্যবধানে অনেক দিন–মাস–বছর–যুগ পার হলেও দৃশ্যপট একই আমাদের সামনে হাজির হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরপরই কতিপয় লেখক–বুদ্ধিজীবী নানা প্রকার গ্রন্থাদি রচনা করে দেখিয়েছেন যে, শেখ মুজিবকে হত্যার স্বকপোলকল্পিত যুক্তি উত্থাপন করে। ১৯৭৫-এর আগস্ট থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সংবাদ সাময়িকপত্রের পাতায় চোখ রাখলেও বিষয়টি ধরা পড়ে যে, এই সময়ে কত বিকৃতভাবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিপরীত প্রবাহে ধাবিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছিল একটি সংঘবদ্ধ বিকৃত ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়াস। আজ দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ১৯৭৫ সালে শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা নয়, বাঙালি জাতিসত্তাকে হত্যা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, বিকৃত ধারায় নেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত চেতনাকে।

তাই সংগত কারণেই এসব বিয়োগান্ত জাতীয় ঘটনাবলির আদ্যোপান্ত নিয়ে সত্যানুসন্ধান কমিশন জাতীয়ভাবেই গঠন করার দাবি রাখে। বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রহসন ঘটনা, আর ৩রা জুলাই মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজের হত্যার পর ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট সবচেয়ে বড়ো বিয়োগান্ত ঘটনা ও কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে বিবেচিত। তবে ১৫ই আগস্ট আরও অধিক বিয়োগান্ত এই কারণে যে, সেদিন শুধু বঙ্গবন্ধুকে নয়, তাঁর গোটা পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। প্রতিটি ঘটনাই ছিল সীমাহীন প্রতিহিংসা পরায়ণতায় ভরপুর। ১৫ই আগস্টের বিয়োগান্ত ঘটনার পরও কিছু বাকি ছিল ঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের। সেই প্রতিহিংসার বিষ ছড়িয়ে পড়ে নিরাপদ ও কঠোর নজরদারির জায়গা কারাগার পর্যন্ত। সেখানে বন্দি বঙ্গবন্ধুর চার সহযোগী, যাঁরা মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অপারগতা দেখিয়েছেন সেই সাহসী জাতীয় চার নেতাকে নারকীয়ভাবে হত্যা করা হয় নৃশংসভাবে। কারাগারে বন্দিকে হত্যা করার এমন জঘন্য হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক ইতিহাসে আর পরিলক্ষিত হয় না। নিশ্চিন্তেই বলা যায়, ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের ঘটনা কোনো সেনা বিদ্রোহ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের প্রকৃতি ও ধরন এবং পরবর্তী তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে

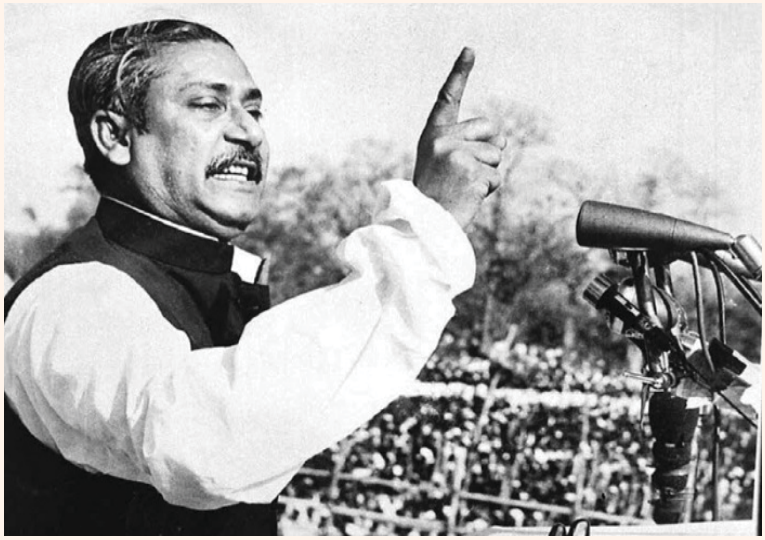

বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ প্রদান করছেন

বলা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডকে একই সরলরেখায় দেখার সুযোগ নেই। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি ধরে এগোলেও দেখা যায় আধুনিক ভারত রাষ্ট্রের জনক মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর ভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শের কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়নি বিচারের ক্ষেত্রে। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী নিহত হয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ঐ সব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের গুরুত্ব এক নয়। এদের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রাষ্ট্রের চরিত্র বা আদর্শের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ব্যক্তি নিহত হয়েছেন এবং হত্যাকাণ্ডের তদন্ত হয়েছে, বিচারের প্রক্রিয়ায় কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের নানা পরিবর্তন আসে সঙ্গে সঙ্গে। ১৫ই আগস্ট ভোরে খুনি মেজর ডালিম বাংলাদেশ বেতারে যে ঘোষণাটি দেন, সেখানেই লক্ষ করা যায় 'বাংলাদেশ বেতার'–এর পরিবর্তে পাকিস্তান আমলের 'রেডিও বাংলাদেশ', শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৯৯৬ পূর্ব প্রতিটি সরকার ১৫ই আগস্টকে 'নাজাত দিবস' হিসেবে পালন করেছে। বিষয়টি পরিষ্কার যে, সহস্র সংগ্রামে অর্জিত মুক্তিসংগ্রামের চেতনাটি নস্যাৎ করার একটি সচেতন পরিকল্পনা ছিল এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্যে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর জঘন্য যে সিদ্ধান্তটি রাষ্ট্রপক্ষ থেকে আসে তাহলো এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাওয়া যাবে না। খোন্দকার মোশতাক সরকার কর্তৃক কুখ্যাত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স তৈরি করে প্রত্যক্ষ হত্যাকারীদের দায়মুক্ত করে দেওয়া হয়। অথচ এই খুনিরা দেশে-বিদেশে প্রকাশ্যে বলে বেড়িয়েছে কীভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছে। আত্মস্বীকৃত হত্যাকারী, খুনির সাহস ও ছায়া ছিল এই দায়মুক্তি বিল। পৃথিবীর আইনি ইতিহাসে এমন জঘন্য ঘটনা বিরল বটে, অথচ স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষকে তা দেখতে হয়েছে দীর্ঘ সময়ব্যাপী। পঁচাত্তরের বিয়োগান্ত ঘটনার পর সামরিক আইন জারি হলেও সংবিধান ও জাতীয় সংসদ সমুন্নত ছিল। আর সংবিধানে একজন নাগরিকের যে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ আছে তাতে যে কেউ বিচার চাওয়ার অধিকার রাখে। রাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হলো, তাঁর বিচার করা যাবে না– এরূপ বিচারহীনতার সংস্কৃতি একটি মর্যাদাশীল জাতি প্রত্যক্ষ করেছে দীর্ঘ সময় ধরে। শেখ মুজিব জাতির পিতা কিংবা প্রেসিডেন্ট না হলেও তিনি টুঙ্গিপাড়ার শেখ লুৎফর রহমানের পুত্র এবং দেশের একজন নাগরিক– সে হিসেবেও তো তাঁর পরিবার বা যে কেউ এই প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ডের বিচার চাইতে পারতেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী এ এফ এম মোহিতুল ইসলাম মামলার সওয়ালজবাবে বলেছেন যে, তিনি ১৯৭৬ সালে লালবাগ থানায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা দায়ের করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু লালবাগ থানা পূর্বে জারি করা অর্ডিন্যান্সের অজুহাতে মামলা গ্রহণ করেনি। বঙ্গবন্ধুর হত্যার ফলে রাজনীতিতে পট পরিবর্তন ও সুযোগ নেওয়া ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বিচারের সকল পথে ধারাবাহিক বাধা সৃষ্টি করেছে নিষ্ঠার সঙ্গে। এভাবেই বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে– একবছর নয়, এক সরকার নয়, এই করে ইতিহাসের পাতায় যুক্ত হয়ে গেল একুশ বছর। পরবর্তীতে জিয়া সরকার ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মোশতাকের জারি করা দায়মুক্তি অধ্যাদেশ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ইতিহাসকে আরও ভারী করে দিল। ইতিহাসের নির্মম ট্র্যাজেডি যে, বঙ্গবন্ধুর হাতে স্বাধীন বাংলাদেশের যে সংবিধান রচিত হলো, সে পবিত্র সংবিধানে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার চাওয়া আটকিয়ে দিয়ে সংবিধানকে কলঙ্কিত করা হলো। পরবর্তী জেনারেল এরশাদ সরকার নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়মুক্তি আইনটি বলবৎ রেখে খুনিদের সুরক্ষা দিয়ে দেশে-বিদেশে ভালো চাকরি করার সুযোগ করে দিয়েছে। আরও দুঃখের বিষয়, স্বঘোষিত এই খুনিদের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগও দিয়েছে এরশাদের সামরিক সরকার। খুনিদের এত তোষামোদি করার কারণটি ছিল সুস্পষ্ট। এই সামরিক সরকারগুলো ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বেনিফিসিয়ারি। নবাব সিরাজের হত্যাকাণ্ডের পর নবাব মীর জাফর আলী খাঁ যেভাবে লুটেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে একের পর এক লুটপাটের সুযোগ নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল, ১৯৭৫ সালের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস ঘাটলে সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি প্রত্যক্ষ করা যায়।

তিন

বিচার না পাওয়ার অসহনীয় যন্ত্রণা আর পরিবারের সবাইকে হারানোর দুঃসহ বেদনা নিয়ে দিন-মাস-বছর অতিবাহিত করেন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা। অবশেষে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন তারিখে বাংলাদেশে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের অনাকাঙ্ক্ষিত অবসানের ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফিরে আসে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ উন্মুক্ত হবার কিছু আশার আলো দেখতে পায় বাঙালি জাতি। ১৯৯৬ সালের ২রা জুলাই তারিখে ১৫ই আগস্ট দিনটিকে 'জাতীয় শোক দিবস' ঘোষণা করে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। এবার কথিত নাজাত দিবস নয়, জাতীয় শোক দিবস। এ ছিল এক এক করে বিগত ২১ বছরের অপপ্রচারের পাহাড় ভাঙার দৃঢ় প্রয়াস। কিন্তু জাতি ভারমুক্ত হতে আরও কিছু কঠিন পদক্ষেপের বাকি ছিল। এবার

শুরু হয় বিচার চাওয়া ও বিচার পাওয়ার প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করার জটিল প্রক্রিয়া। ১৯৯৬ সালের ২রা অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় শেখ মুজিব হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার বাদী হন এ এফ এম মোহিতুল ইসলাম। যিনি ছিলেন ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী এবং ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী। একই বছরের ১২ই নভেম্বর তারিখে জাতীয় সংসদে বহু প্রতীক্ষিত ইনডেমনিটি আইন বাতিলের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদ ভারমুক্ত হয়। কিন্তু এই বিলের বিরোধিতা করে সে দিনের বিরোধী দল সংসদ অধিবেশন বর্জন করে আবারও প্রমাণ করেছিল, এরা একজন প্রেসিডেন্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার চায় না। ১৯৯৭ সালের ১৪ই জানুয়ারি হাইকোর্ট ডিভিশন থেকে প্রত্যাশিত সেই ঘোষণা আসে যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ রাখার লক্ষ্যে যে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল সেটি সংবিধানের কোনো অংশ নয়। এই আদেশের ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়ার পথ আরও সুগম হয়। এই কাঙ্ক্ষিত আদেশের পর ঐ বছরের ২১শে এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার কার্য শুরু হয়। দীর্ঘ বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে বিচার মামলা চলার পর ১৯৯৮ সালের ৮ই নভেম্বর বিচারিক আদালত হত্যাকাণ্ডের প্রত্যাশিত রায় প্রদান করে। ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল কর্তৃক ৭৬ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণায় ১৫ জনকে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। এইভাবে দীর্ঘ ২৩ বছর পর দেশের রাষ্ট্রপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায়ের মাধ্যমে গোটা জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়। কিন্তু আবার রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন। মামলাটি যখন হাইকোর্টে আপিল চলছিল তখনই ক্ষমতায় আসীন হয় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত এই জোট সরকার মামলাটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দিয়ে আবারও আইনের স্বাভাবিক গতিপথকে রুদ্ধ করে দেয়। এই ক্ষমতাসীন অংশটি ১৯৭৫ সালের পর রাজনীতিতে পুনর্বাসিত এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে প্রকাশ্যবিরোধী ধারার ঘৃণ্য রাজনীতিক। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মামলাটি শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠিত হয়। নানা ষড়যন্ত্র ও মামলা-মোকদ্দমার পর ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পুনরায় সরকার গঠিত হয়। ২০০৯ সালে ২৯ দিন শুনানির পর ১৯শে নভেম্বর প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচজন বিচারপতি রায় ঘোষণায় আপিল খারিজ করে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। দেখা যায় ১৯৯৮ সালে ৮ই নভেম্বর থেকে ২০০৯ সালের ২৪শে আগস্ট পর্যন্ত বাদী-বিবাদীর আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে চার দফায় রায় প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ আপিল বিভাগ ২০০৯ সালের ৫ই অক্টোবর থেকে টানা ২৯ দিন কর্মদিবস শুনানির পর ১৯শে নভেম্বর সেই চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন। ২০১০ সালের ২রা জানুয়ারি আপিল বিভাগে আসামিদের রিভিউ পিটিশন দাখিল এবং তিনদিন শুনানি শেষে ২৭শে জানুয়ারি চার বিচারপতি রিভিউ পিটিশনও খারিজ করে দেয়। এই দিনেই মধ্যরাতে ২৮শে জানুয়ারি বন্দি পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি বাস্তবায়িত হয় এই বাংলার মাটিতে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত প্রতিটি আইনি স্তরে মামলাটি পরিচালিত হয়েছে। আসামিগণ আইনের আশ্রয় নেওয়ার সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এই দীর্ঘ আইনি লড়াইটি কী প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হলো এবং সওয়ালজবাব কী ছিল ইত্যাদি বিষয়ের দীর্ঘ ও বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন আইনজীবী জাহাঙ্গীর আলম সরকার তার প্রণীত *বঙ্গবন্ধু হত্যা: বিচারবিহীনতার সংস্কৃতি* শীর্ষক গ্রন্থে। বহুকাঙ্ক্ষিত বিচারের রায়ের পরও জাতির দায়মুক্তির কারণেই আরও দাবি থেকেই যায়, প্রত্যক্ষ খুনি সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে, কিন্তু আড়ালে থাকা রাজনৈতিক মদদদাতা ষড়যন্ত্রকারী কুশীলব ছিলেন কে বা কারা, আইনের মাধ্যমেই এদের খুঁজে বের করা এবং বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করা অতি জরুরি।

লেখক: অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের নির্দেশনা

পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র খুলে দিয়েছে সরকার। ১৯শে আগস্ট প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা পর্যটকগণকে অনুসরণ করতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে :

- কোনো ট্যুরের বিপরীতে হোটেল, পরিবহণ ও পর্যটন আকর্ষণ স্থানের অনলাইন বুকিং এবং অনলাইন অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করা;
- ভ্রমণ করার পূর্বে সাধারণ স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ সঙ্গে রাখা;
- হ্যান্ডশেক, আলিঙ্গন এড়াতে নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রথা অনুযায়ী শুভেচ্ছা জানানো ও গ্রহণ করা;
- যে-কোনো লম্বা লাইন, ভিড় এবং দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ এড়াতে ট্যুরের সময়সূচি, প্রবেশের টিকেট, সিট, রাইড ইত্যাদি ক্রয় পূর্বেই নিশ্চিত করা;
- গ্রুপ সফরের পরিবর্তে ছোটো বা পারিবারিক ভ্রমণ করা;
- স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং ভ্রমণসূচি বহির্ভূত আয়োজন পরিহার করা;
- ট্যুরের আগে অথবা ট্যুরকালীন ট্র্যাভেল এজেন্ট এবং অন্যান্য সেবা সরবরাহকারীকে পর্যটকের জরুরি যোগাযোগ নম্বর/ অবস্থানের ঠিকানা এবং অ্যালার্জিজনিত (যদি থাকে) সমস্যাগুলো জানিয়ে রাখা;
- সকল প্রকার জরুরি ওষুধ, কাগজপত্র/ যে-কোনো জটিল রোগের রিপোর্ট, পর্যাপ্ত নগদ অর্থ, পোশাক ইত্যাদি সঙ্গে রাখা;
- অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পর্যটকের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ট্যুর ম্যানেজারের কাছে জানিয়ে রাখা, ভ্রমণের সময় স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে অনুরোধ করা;
- ভ্রমণের সময় মাস্ক, ব্যক্তিগত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদি ব্যবহার করা;
- সর্বসাধারণের স্পর্শস্থান যেমন: টেবিল, ডোর লক এবং হ্যান্ডেল, কাউন্টার টেবিল, চেয়ার, চেয়ার টেবিল কভার, মুদ্রণ ও প্রচার সামগ্রী, রেলিং, জানালার পর্দা, খাবারের পাত্র স্পর্শ না করা বা এড়িয়ে চলা;
- স্থানীয় কোভিড-১৯ অপারেশন প্রটোকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং স্থানীয় সেবা প্রদানকারী ও কর্মীদের সহযোগিতা করা;
- যারা করোনার টিকা গ্রহণ করেননি তাদেরকে পর্যটন কেন্দ্রে যাওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করা;
- ভ্রমণের ক্ষেত্রে পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের না নেওয়া;
- অসুস্থবোধ করলে ট্যুর ম্যানেজার/ হোটেল/ নিকটবর্তী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;

এছাড়া সরকার ঘোষিত অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা।

প্রতিবেদন: শহিদুল ইসলাম

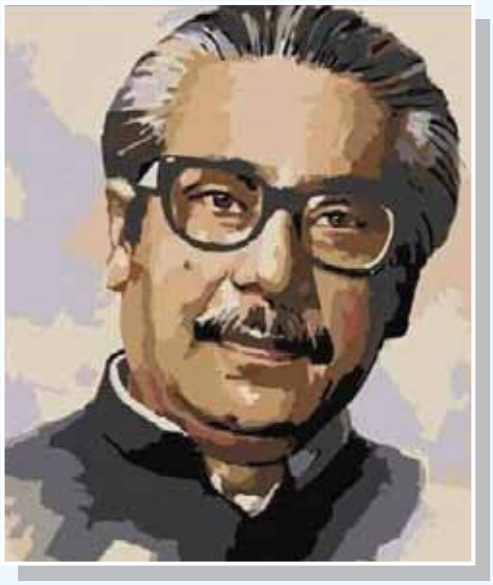

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: জানা-অজানা কথকতা

প্রফেসর ড. শেখ রেজাউল করিম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর অবদান বিশ্ববিদিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের মানচিত্র বঙ্গবন্ধুর রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের হাত থেকে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার পথে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গীত করেছেন। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন-সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের সুবর্ণ সময়গুলো কারাগারে অতিবাহিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে তিনি দীর্ঘদিন কারাভোগ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় একদিনে অর্জিত হয়নি। ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং সাতই মার্চের সেই অগ্নিঝরা ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু আজ জাতির পিতা।

দেশকে ভালোবাসতে হলে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে একইসূত্রে বাঁধতে হবে। একটা থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। আজ বাঙালি জাতির এই আত্মোপলব্ধি মিশে রয়েছে অস্তিত্ব ও বিশ্বাসের সঙ্গে। দেশের এই উন্নয়ন-অগ্রগতি ও বিশ্বের মানচিত্রে আমাদের সমুন্নত আত্মমর্যাদা সবই সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রাম-আন্দোলন ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুকে চর্চা করতে হবে এবং তাঁর আদর্শের পথ অনুসরণ করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য এবং তাদের দেশপ্রেম জাগ্রত করার জন্য বঙ্গবন্ধু আদর্শ অন্তরে ধারণ করতে হবে। কবি সুকান্তের ভাষায়– 'এই বিশ্বকে করে যাব শিশুর বাসযোগ্য'। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *আমার দেখা নয়াচীন* ও *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই গ্রন্থগুলো অবশ্য অবশ্যই আমাদের পাঠ করতে হবে, ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যাতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সংগ্রাম আন্দোলনের পথ সুগম ও মসৃণ ছিল না পাকিস্তানি হায়েনার নাগপাশ থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হলেও পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর একটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বাঙালির জীবনে এক কালো অধ্যায় নেমে আসে ১৯৭৫ সালের শোকাবহ ১৫ই আগস্টে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আবার অন্ধকার মুক্ত হয় এবং পাকিস্তানি হানাদার গোষ্ঠীর দোসরদের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে এবং যুদ্ধাপরাধী ও বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের আওতায় আনা ও বিচার করা সম্ভব হয়েছে। আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে যুক্ত হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে এই দেশ বিশ্বের মানচিত্রে আজ সমুন্নত। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুকে আমাদের চর্চা করতে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলন

বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানাবিধ ঘটনা বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে একইসূত্রে গ্রথিত। আমরা জানি, বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র জীবন বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে উৎসর্গ করেছেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত এবং পাকিস্তান আলাদা হলেও বাঙালিদের স্বাধিকার অর্জিত হয়নি। পাকিস্তানি শাসকের শাসন-শোষণ ও ষড়যন্ত্রের ফলে প্রথম থেকেই বাঙালির জীবনে নেমে আসে অমানিশা। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর নির্মম হামলা ও গুলিবর্ষণ হলেও এর শুরুটা ছিল দেশভাগের প্রথম থেকেই। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে নানাভাবে দুরভিসন্ধির আশ্রয় নেয়। এক পর্যায়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের নগ্নরূপ আমরা দেখতে পাই। বাঙালি প্রথম থেকেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। এরপর স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত থাকে এবং একইসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কারাভোগের পরিধিও বাড়তে থাকে ।

১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের আলোকে ১৯৬৬ সালে বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে এই ছয় দফা ছিল বাঙালির প্রাণের দাবি এবং ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু জনগণের মুক্তির প্রথম দরজা উন্মোচন করেন। ছয় দফার সারসংক্ষেপ :

১. সরকার হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয় পদ্ধতির। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হবেন জনসংখ্যার অনুপাতে।

২. প্রাদেশিক ও বৈদেশিক বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। বাদবাকি বিষয়গুলো অঙ্গরাজ্য দেখবে।

৩. রাষ্ট্রের জন্য দুই ধরনের বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে এবং উভয় অঙ্গরাজ্যে রিজার্ভ ব্যাংক এটি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কেন্দ্রের হাতে এই মুদ্রা নিয়ন্ত্রিত হবে, যাতে কোনো অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলে পাচার না হয়।

৪. আঞ্চলিক সরকারের হাতে কর আদায় ও ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে। এই রাজস্ব জমা দেওয়ার নির্দেশনা সংবিধানে যুক্ত থাকবে।

৫. অঙ্গরাজ্যের বৈদেশিক মুদ্রার আয় পৃথক হিসাব রাখবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নিজস্ব এখতিয়ারে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্য সমানভাবে বা আনুপাতিক হারে জোগান দেবে। উভয় অঙ্গরাজ্যের উৎপাদিত দ্রব্য আদান-প্রদান করমুক্ত হবে।

৬. আঞ্চলিক ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বাধীনভাবে বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।

আমরা ছয় দফার ভেতরে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা লক্ষ করি। যখন সীমাহীন বঞ্চনা পূর্ব পাকিস্তানকে নিষ্পেষিত করছে বঙ্গবন্ধু তখন হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। ছয় দফা হয়ে ওঠে বাঙালির প্রাণের দাবি। উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এসময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছয় দফা সম্পর্কে মন্তব্য করেন– 'এটি স্বাধীন বাংলা বাস্তবায়নের একটি নীলনকশা'। বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার–জেল-জুলুম-নির্যাতন কোনো কিছুকে ভয় পাননি। তিনি এই ছয় দফার মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলন

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান বাঙালির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ছয় দফা ঘোষণার মধ্যে দিয়েই বঙ্গবন্ধু আবারও গ্রেপ্তার হন, নানা অভিযোগ বঙ্গবন্ধুর উপরে আনা হয়। ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনে ২০শে জানুয়ারি আসাদ শহিদ হন। এই সময়ে যে স্লোগান ধ্বনিত হয় তা ছিল:

পাকিস্তান না বাংলা, বাংলা বাংলা
বাংলা জাগো জাগো বাঙালি জাগো
তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল স্লোগান ছিল 'জয় বাংলা'।

উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির বিজয় লক্ষ করি। বাঙালির অগ্নিঝরা স্লোগান ছিল– 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো'। জনতার কাছে পরাজিত হয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। ২২শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে দেওয়া হয় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি। উনসত্তরের গণ-আন্দোলন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এর ফলে ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে জনগণ বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন জানায় কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে নির্বাচিত দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। ফলে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালির জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ এই ভাষণের মধ্য দিয়ে ত্বরান্বিত হয়েছে। ঢাকার রেসকোর্স ময়দান বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। পৃথিবীর সেরা ভাষণগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ অন্যতম। এই ভাষণের মূল বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্ততা এবং অলিখিত। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাঙালির দীর্ঘ শাসন-শোষণের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন অপরদিকে প্রতিরোধমূলক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এই ভাষণের মধ্যে তিনি বলেন–

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেসকো ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এই ভাষণটিকে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রারে' সংযুক্ত করেছে। বঙ্গবন্ধু এই অলিখিত ভাষণে যে ভাষাগত কৌশল অবলম্বন করেছেন তাতে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও সকল নির্দেশনা থাকলেও আইনগতভাবে এই ভাষণটি বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ। কোনোভাবেই এতে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যা দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না এবং পাকিস্তান ভাঙার অভিযোগ দেওয়ারও সুযোগ ছিল না।

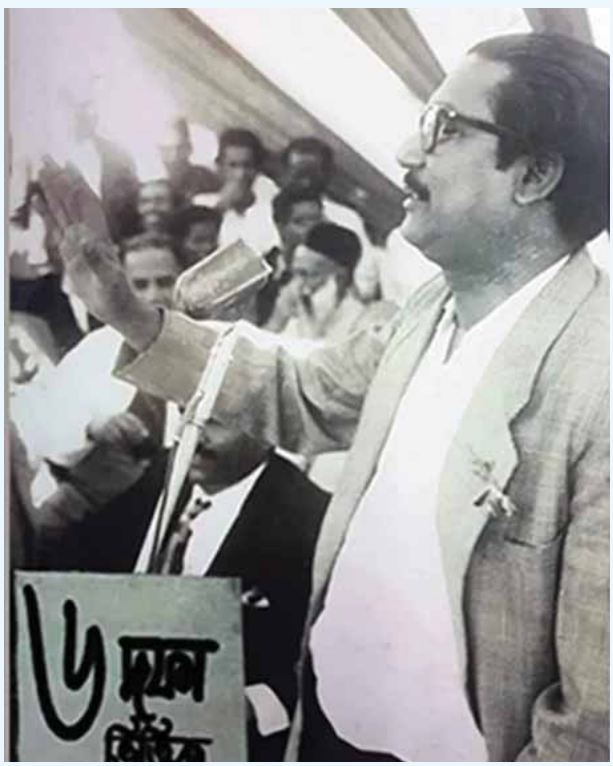

বঙ্গবন্ধু এই ভাষণে বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করেছেন এবং এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন– 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা রাস্তাঘাট সবকিছু বন্ধ করে দেবে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য দীর্ঘকাল কারাভোগ করেছেন এবং বাঙালিকে দিয়েছেন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তিনিই আমাদের পাথেয়। তাঁর উত্তরাধিকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত করতে না পারলে বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। তাই বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চায় নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

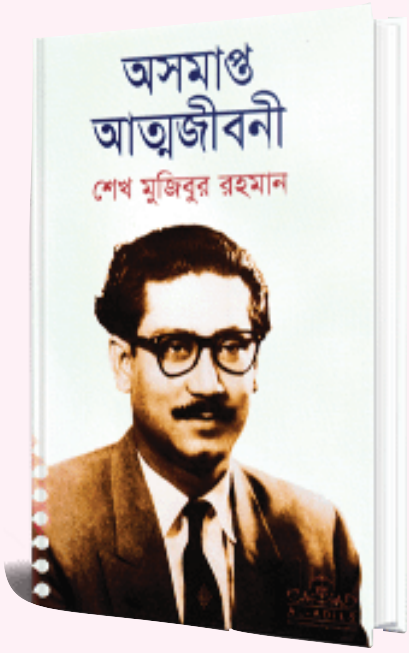

বঙ্গবন্ধুর Amgvß AvZ¥Rxebx: তুলনামূলক পাঠ

ড. মোহাম্মদ হাননান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমসাময়িক অনেক রাজনীতিকই আত্মজীবনী লিখেছেন। তবে তাঁদের বেশিরভাগই লিখেছেন মুক্তজীবন থেকে অথবা ক্ষমতায় আসীন অবস্থায়। এদের মধ্যে আতাউর রহমান খানের *ওজারতির দুই বছর*, *স্বৈরাচারের দশ বছর*; আবুল মনসুর আহমদের *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*; জেনারেল আইয়ুব খানের *প্রভু নয় বন্ধু*; অলি আহাদের *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫*; খোকা রায়ের *সংগ্রামের তিনদশক*; মহিউদ্দীন আহমেদের *আমার জীবন আমার রাজনীতি* প্রমুখের গ্রন্থ বেশ আলোচিত ও পরিচিত।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীটি যতটুকু পাওয়া গেছে, তা লেখা হয়েছে বন্দিজীবন থেকে। সেদিক থেকে এটি ব্যতিক্রম। তিনি এটা লেখার জন্য তাঁর সমসাময়িকদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পাননি। ঘটনাসমূহ যাচাইয়ের জন্য কোনো বই, সংবাদপত্র বা অন্যান্য তথ্য আধারের সাহায্যও নিতে পারেননি। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পড়তে পড়তে মনে হয়, তিনি লিখে গেছেন বিরামহীনভাবে কোনো কিছুর বা কারো সহায়তা ছাড়াই।

লেখালেখির এ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁর আত্মজীবনী কতটুকু ইতিহাসের ধারাবাহী হয়েছে, ঘটনা বর্ণনা কতটুকু হয়েছে অনুপুঙ্খ, তা সমসাময়িকদের আত্মজীবনীর সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে বিস্মিত হতে হয়। বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ইতিহাস জ্ঞান ইতিহাসবিদদের মুগ্ধ করে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন তা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। কয়েকটি ঘটনার তুলনামূলক পাঠ বিশ্লেষণ করলে এর সত্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

কৈশোরে গোপালগঞ্জে একটি ঘটনাসূত্রে পুলিশ কিশোর মুজিবকে গ্রেপ্তার করতে খুঁজছিল। একজন আত্মীয় এসে গ্রেপ্তার এড়াতে পালানোর পরামর্শ দিলে মুজিব বলেন, 'আমি পারব না'। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা ১২)। বঙ্গবন্ধুবিরোধী একজন রাজনীতিক অলি আহাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনে শেখ সাহেব কখনও আত্মগোপন করেন নাই'। (অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫*, পৃষ্ঠা ৪৮৩)।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চেও বঙ্গবন্ধুকে পালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পালাতে অস্বীকার করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এক বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'মার্চের সেই রাতে আমাকে ছেড়ে যাবার সময় আমার সহকর্মী তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ও অন্যান্যরা কাঁদছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, এখানেই আমি মরতে চাই। তবুও মাথা নত করতে পারব না'। (১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে রেসকোর্সের জনসভায় বক্তৃতা, *দৈনিক বাংলা*, ১১ই জানুয়ারি ১৯৭২)।

পাকিস্তান আমলের আরেকটি ঘটনা। মুজিবকে গ্রেপ্তার করতে হুলিয়া জারি হয়েছে। মওলানা ভাসানী খবর পাঠালেন, মুজিব যেন পালিয়ে থাকে। মুজিব এ ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন,

> তখন মওলানা ভাসানী ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে থাকতেন। ... তিনি কেন আমাকে গ্রেফতার হতে নিষেধ করেছেন? আমি পালিয়ে থাকার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। কারণ, আমি গোপন রাজনীতি পছন্দ করি না। ... মওলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'কি ব্যাপার, কেন পালিয়ে বেড়াব'। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা ১৩৪)।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭ পূর্ববর্তী) এবং পাকিস্তানেরও প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭ পরবর্তী) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে অনেক মূল্যায়ন ও মন্তব্য করেন, 'শহীদ সাহেব ছিলেন উদার, নীচতা ছিল না, দল-মত দেখতেন না, কোটারি করতে জানতেন না, গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না।... বাঙালিরা শহীদ সাহেবকে প্রথম চিনতে পারে নাই। যখন চিনতে পারল, তখন আর সময় ছিল না'। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯)। বাংলাদেশের রাজনীতিকদের নিয়েই বঙ্গবন্ধুর এ মন্তব্য। তবে পরবর্তীকালে ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় সোহরাওয়ার্দীর যথাযথ মূল্যায়ন করে লিখেছেন, 'দেশ ভাগ হওয়ার পর কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয়। সমস্ত মুসলিম ... ঢাকার পথে পাড়ি দেয়। সবারই আগে খাজা নাজিমুদ্দীন...। সোহরাওয়ার্দী সাহেবই একমাত্র লোক দাঙ্গা বিধ্বস্ত মুসলিম আম জনতার পাশে রয়ে যান'। (মোজাফফর আহমদ, *মাওবাদী সমাজতন্ত্র ও কিছু কথা*, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩)।

কিন্তু সেদিনের বামপন্থি কমিউনিস্ট ও ছাত্রকর্মীরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে চিনেনি, তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন, আজও তাঁরা তা সংশোধন করেননি। ২০০৫ সালে কমরেড হায়দার আকবর খান রনো তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেন। এতে সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে অনেক কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য রয়েছে। ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলনের সময় সোহরাওয়ার্দী যখন ঢাকায় আসেন তখন ছাত্র নেতাদের সাথে তাঁর তর্ক-বিতর্ক হয়। রনো লিখেন–

> সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমাদের প্রজন্মের তরুণদের চিনতেন না। যুক্তি-তর্কের এক পর্যায়ে কাজী জাফর আহমদ বলেই

বসলেন, 'আমরা আমতলা থেকেই আপনাকে মুক্ত করে এনেছি, আবার আমতলাতেই আমরা কবর দিতে পারি'। (হায়দার আকবর খান রনো, *শতাব্দী পেরিয়ে*, পৃষ্ঠা ৫৯)।

সম্প্রতি চীনপন্থি কমিউনিস্ট নেতা এবং সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেননেরও আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তিনিও এ ঘটনার উল্লেখ করে লিখেন–

ছাত্রনেতাদের এই আচরণে সোহরাওয়ার্দী খুব বিরক্ত হন। কিন্তু কাজী জাফর আগের মতোই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমরা আমতলার থেকে আপনাকে নিয়ে এসেছি, ওই আমতলাতেই কবর দেব'। (রাশেদ খান মেনন, *এক জীবন*, পৃষ্ঠা ৯২)।

বঙ্গবন্ধু *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে লিখেছেন, 'বাঙালিরা শহীদ সাহেবকে প্রথম চিনতে পারে নাই'। (পৃষ্ঠা ৪৭) বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দেখতেন, একদল বাঙালি এখনও সোহরাওয়ার্দীকে চিনতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আমতলা বা জামতলার লোক ছিলেন না । তিনি সে সময়ের সমগ্র পাকিস্তানের অভিজাত বংশ থেকে আসা একজন রাজনীতিক ছিলেন, একমাত্র যিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে রাজনীতি করেছেন, যাঁর তুলনায় সে সময়ের পাকিস্তানের একজনও ছিল না, এমনকি খাজা-নবাবজাদা নাজিমুদ্দীন-লিয়াকত আলী খানরাও ছিলেন না। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে বঙ্গবন্ধুর আফসোসটি সে কারণে বড়ো হয়ে দেখা দেয় যে বাঙালিরা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে 'চিনতে পারে নাই'।

১৯৪৮ সালের ১৬ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নিয়ে এক শ্রেণির লেখক যে উপহাস করে মিথ্যে ইতিহাস লিখেছেন, তার তুলনামূলক পাঠটি দেখুন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, '১৬ তারিখ (১৬ই মার্চ ১৯৪৮- লেখক) সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভায় আমরা সকলেই যোগদান করলাম। হঠাৎ কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করে বসল সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য। সকলেই সমর্থন করল। বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হল'। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা ৯৬)।

ভাষা আন্দোলনের লেখক-গবেষক বদরুদ্দীন উমর এ ঘটনাকে উপহাস করে লিখেছেন, '১৬ তারিখে ... বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই বেলা দেড়টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান কালো শেরোয়ানী এবং জিন্নাহ টুপি পরিহিত হয়ে একটি হাতলবিহীন চেয়ারে সভাপতির আসন অধিকার করে বসেন'। (বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩)।

১৯৪৮ সালের এই প্রথম পর্বের ভাষা আন্দোলনের প্রধান ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন অলি আহাদ। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এ ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, '...আমরা ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেলতলায় এক সাধারণ ছাত্রসভা আহ্বান করি। সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন'। (অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি*, পৃষ্ঠা ৫৯)। যদি ছাত্রসভায় মুজিবের সভাপতিত্ব করার কথা না থাকত, তাহলে অলি আহাদ সেটা লিখতেন, কারণ অলি আহাদ আমৃত্যু বঙ্গবন্ধুকে 'শত্রু' মনে করে গেছেন। অথচ উমর সাহেবরা মিথ্যে ইতিহাস লিখে গেছেন, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বের হওয়ার পরও এটা সংশোধন করেননি।

বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমলাদের কলকাঠি নাড়া ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। লিখেছেন, 'গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তাঁকে অর্থমন্ত্রী করার ফলে আমলাতন্ত্র মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর সাথে সাথে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল হয়ে একটা শক্তিশালী সরকারি কর্মচারী গ্রুপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলায় আজিজ আহমদ চিফ সেক্রেটারি ছিলেন। সত্যিকার ক্ষমতা তিনিই ব্যবহার করতেন। নূরুল আমীন তাঁর কথা ছাড়া এক পাও নড়তেন না'। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৪)।

ভাষা আন্দোলনের সময় বাঙালি হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই নূরুল আমীন। পরবর্তীকালে নূরুল আমীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে তার ভূমিকা প্রসঙ্গে একটি চটি বই লিখেছিলেন। এতে তিনিও স্বীকার করেছেন, 'বৃটিশ আমলের সুসংগঠিত আমলাতন্ত্রের কিছু উচ্চাভিলাষী লোক, কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলী খানের ইন্তেকালের পর কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে'। অন্যত্র, 'পল্টনের জনসভায় (১৯৫২ সালের- লেখক) তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে ... এটাও ছিল আমলাদের একটা চাল'। (নূরুল আমীন : *যে কথা এতোদিন বলিনি*, পৃষ্ঠা ৩)।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে পূর্ব বাংলার গভর্নর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান (৭ই জুন, ১৯৫৭)

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর সুবিশাল আত্মজীবনীতেও পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, যা বঙ্গবন্ধুর তথ্যের পরিপূরক। তিনি লিখেছেন,

> তিনি (পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী- লেখক) মি. কেরামতুল্লাহর বদলে মি. আজিজ আহমদকে বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারি নিযুক্ত করলেন।... মি. আজিজ আহমদ শুধু সর্বজ্যেষ্ঠ আইসিএসই নন। 'মোস্ট স্টিফনেকেড ব্যুরোক্র্যাট' বলিয়া তাঁর বদনাম বা সুনাম আছে। মন্ত্রীদের কোনো কথা তিনি শোনেন না। মন্ত্রীদেরই তিনি কানি আঙ্গুলের চারপাশে ঘুরান।... পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারি থাকা অবস্থায় জনাব নূরুল আমীনের আমলে একবার তিনি হাইকোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীসহ সমস্ত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সিক্রেট ফাইল রাখি।... লোকে বলাবলি করিত আসলে চিফ সেক্রেটারিই পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী। (আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৪৫)।

পাকিস্তানের রাজনীতির আমলাতন্ত্রের দীর্ঘ এক ফিরিস্তি রয়েছে এই *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে । বঙ্গবন্ধু এ বই লেখার সময় কোনো লাইব্রেরি ওয়ার্ক করার সুযোগ পাননি, লিখেছেন একেবারেই স্মৃতি থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে যাঁরা একই বিষয় নিয়ে লিখেছেন তাঁদের গ্রন্থের সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থে তথ্যের কোনো ঘাটতি নেই। বরং অসাধারণ এক সাযুজ্য ধরা পড়ে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে এরকম অসংখ্য ইতিহাস ও তথ্য রয়েছে, যা সমসাময়িক অন্যদের লেখা আত্মজীবনীর সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির শক্তিটি ধরা পড়ে। সর্বশেষ একটি বিষয় এখানে উদ্ধৃত করছি, সেটা হলো বঙ্গবন্ধুর একটা দীর্ঘশ্বাস 'বাঙালিদের দুঃখের দিন শুরু হল'। সেটা কোনদিন–

> পূর্ব বাংলার গভর্নর শাসন জারি করার দিন (১৯৫৪ সালের ৩০শে মে- লেখক) প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী যে বক্তৃতা রেডিও মারফত করেন, তাতে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক সাহেবকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ও আমাকে 'দাঙ্গাকারী' বলে আক্রমণ করেন। আমাদের নেতারা যাঁরা বাইরে রইলেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ করাও দরকার মনে করলেন না।... ঠিক মনে নাই, তবে দুই-তিন দিন পরে আমাকে আবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হল। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা ২৭৩)।

আবুল মনসুর আহমদ এ প্রসঙ্গটা আরও খোলাসা করেছেন, তিনি লিখেছেন,

> পরদিন (৩১শে মে ১৯৫৪-লেখক) বেলা দুইটায় সিমসন রোডস্থ যুক্তফ্রন্ট অফিসে যুক্তফ্রন্ট পার্টির এক সভা ডাকা হইল।... পার্টি লিডারকে নজরবন্দী ও অন্যতম মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।... আমরা বেশ কয়েকজন তখন হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া সমস্ত অবস্থা ও আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাইলাম।... হক সাহেব আমাদের... গোলাবি চিত্রে টলিলেন না।... বুঝিয়া আসিলাম শেরে বাংলা হক সাহেব বেশ একটু ভয় পাইয়াছেন। (*আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃষ্ঠা ২৮০-২৮১)।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান লিখেছেন এর পরের পাঠটি:

> শেখ মুজিবুর রহমান ও আবুল মনসুরের নামে একাধিক মামলা দায়ের হলো।... শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের অভিযান খুব ব্যাপক। দেশের সর্বত্র কর্মীদের নিয়ে টানাটানি হয়েছে।... শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, দুর্নীতি বিভাগের বেতনভুক্ত পোষ্য কয়েকটি দালাল ছাড়া আর কোনো সাক্ষী কাঠগড়ায় আনতে পারেনি।... শেষ পর্যন্ত একটা মোকাদ্দমা গেল জজকোর্টে। (উকিল হিসেবে- লেখক) সোহরাওয়ার্দী তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। জজ বাহাদুরকে অনুরোধ করা হলো, আসামিকে তাঁর উকিলের পাশে বসার অনুমতি দেওয়া হোক। মাঝে মাঝে পরামর্শ নিতে হবে, কাগজপত্র দেখাতে হবে। ধর্মাধিচরণ প্রায় গর্জে উঠলেন, নো।... দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রইল শেখ মুজিবুর রহমান। বিচারান্তে রায় দিলেন, জেল। হাইকোর্টে আপিল হলো। মহামান্য বিচারপতি তাঁকে (মুজিবকে- লেখক) নির্দোষ খালাস দিলেন। (আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩)।

বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'র তুলনামূলক পাঠ তাই ইতিহাসের জন্য জরুরি। আজকের প্রজন্মের জন্য আরও জরুরি। যেমন করে পাকিস্তান আমলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান থেকে বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন, তার কাহিনি তো ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক অন্যান্য রাজনীতিক ও ইতিহাসবিদদের স্মৃতিকথা ও গবেষণা গ্রন্থেও। এগুলো মিলিয়ে পড়লে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'র পাঠটির লেখনীর দৃঢ়তা, শুদ্ধতা এবং সঠিকতা অধিক পরিস্ফুটিত হয়।

লেখক: প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার ও গবেষক

নিউইয়র্কে টাইমস স্কয়ারে বঙ্গবন্ধুর ছবি

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের মধ্যরাতে নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারের প্রধান বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রদর্শন করা হয়। ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রদর্শন করা হয় ৭২০ বার। ১০ই আগস্ট রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এ তথ্য জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তার আগে আনোয়ার গ্রুপ ও ফাইন্যান্স গ্রুপ এ প্রদর্শনীর জন্য ২৫ লাখ টাকা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চেক হস্তান্তর করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ১৫ই আগস্ট রাত ১২টা থেকে শুরু হয়ে পরের দিন পর্যন্ত প্রতি দুই মিনিটে ১৫ সেকেন্ড করে টাইমস স্কয়ারের পুরো বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধুর আলো ঝলমলে ছবি প্রদর্শিত হয়। এরকম ৭২০ বার বিলবোর্ডে ভেসে উঠে বঙ্গবন্ধুর ছবি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রদর্শনীর ছবিতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক থাকে। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হবে। বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দায়বদ্ধতা আছে। বঙ্গবন্ধুর কথা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রবাসীরা নিজ উদ্যোগে এসব আয়োজন করেছেন বলে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা প্রত্যেকটা মিশনে বঙ্গবন্ধু কর্নার করেছি। এটা শুধু কর্নার না, এগুলোতে বঙ্গবন্ধুর ছবি, ভিডিও বার্তা রাখা হয়েছে। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবাইকে জানানো।

প্রতিবেদন: মুরাদ হোসেন

নজরুলের প্রথম লেখাপ্রকাশ এবং আজকের বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. সৌমিত্র শেখর

আজকের বাংলাদেশ, সেদিনের পূর্ববঙ্গ কাজী নজরুল ইসলামের ব্যক্তি ও সাহিত্যিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তাই পূর্ববঙ্গে তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা এবং পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর (পরে বাংলাদেশের রাজধানী) ঢাকায় প্রথম প্রকাশিত রচনা কোনটি এবং কোন কোন পত্রিকায় সেগুলো প্রকাশ হয়েছিল– এ জিজ্ঞাসা নজরুল-অনুসন্ধিৎসুদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। তবে অবাক হওয়ার ব্যাপার, ঢাকা থেকে কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম লেখাপ্রকাশ হয়েছে লেখক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা পাবার অন্তত ছয় বছর পরে। ততদিনে তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলো বের হয়েছে; সব মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থও বারোটি! অথচ পনেরো বছর বয়সেই বাংলাদেশে প্রথম আসেন নজরুল। এরপর নানা কারণে পূর্ববঙ্গে তিনি আসা-যাওয়া করছিলেন। কিন্তু ঢাকা থেকে তাঁর কোনো লেখাপ্রকাশের সংবাদ পাওয়া যায় অনেক পরে।

নজরুলের প্রথম রচনা

কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম রচনা কোনটি সে বিতর্ক এখনো শেষ হয়নি। দশ-এগারো বছর বয়স থেকেই তিনি পারসি-উর্দু-আরবি মিশ্রিত বাংলায় গান লেখার চেষ্টা করেন। পারিবারিক ঐতিহ্য, বিশেষ করে পিতৃব্য কাজী বজলে করিম এ ব্যাপারে নজরুলের প্রেরণা হয়ে ওঠেন। এরপর লেটোদল, কবিগানের দল ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারো-তেরো বছর বয়সেই বেশ কিছু পালাগান লিখে ফেলেন তিনি। "নজরুল সেসময় 'চাষার সঙ', 'ঠাকুরের সঙ', 'রাজা যুধিষ্ঠিরের পালা', 'শকুনি বধ', 'মেঘনাদবধ', 'দাতা কর্ণ', 'বিদ্যাভূতুম', 'রাজপুত্রের সঙ', 'কবি কালিদাস', 'আকবর বাদশা' ইত্যাদি পালাগান রচনা করেন।" (হক, ২০১০ : ২) যে কারণে বিদ্যালয়ে যখন তিনি পড়েন, তখন শিক্ষকদের আগমন-বিদায় উপলক্ষে যে সংবর্ধনা দেওয়া হতো, সেখানে ছাত্রদের পক্ষ থেকে পরিবেশিত কাব্যবচন লেখার ভার পড়ত নজরুলের ওপর। 'বন্দনা-গান', 'চাষীর গীত', 'প্রেমের ছলনা' ইত্যাদি নজরুল ইসলাম লেটোদলের জন্য লিখেছিলেন।[১] এগুলো সেখানে গাওয়া হতো। যেমন– 'বন্দনা-গান'-এ আছে আল্লাহ-রসুল-পির-গুরু স্মরণ; 'চাষীর গীত'-এ আছে দেহকে জমি ভেবে নামাজ-রোজা-কলেমা-ইমান দিয়ে চাষের আহ্বান এবং বিধি অনুসারে চাষ করে কীট থেকে ফসল রক্ষার তাগিদ; 'প্রেমের ছলনা'তে আছে রাধার বিরহদশার উল্লেখ। নিতান্তই কচিহাতের সরল কল্পনা এখানে। এরকম অনেক লেখা হারিয়ে গেছে, পাওয়া যায়নি। 'চাষীর গীত' অনেক পরে (১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ঈদ সংখ্যা) সাপ্তাহিক *মিল্লাত* পত্রিকা ছেপেছিল। [কাদির, ১৯৯৩(গ) : ১০৩২] নজরুলের বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন (মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৫ : ১৮), কবি যখন রানিগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন 'চড়ুই পাখির ছানা' শিরোনামে একটি পদ্য লেখেন। পদ্যটির বক্তব্য হলো: বড়ো দালানের ফাঁকে চড়ুইয়ের বাসা থেকে একটি ছানা নিচে পড়ে যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেটাকে পেয়ে কেউ পকেটে নেয়, কেউ হাতে নেয়, কেউবা ছাতার ভেতরে পুরে নেয়– এভাবেই খেলে। মা-চড়ুই এটা দেখে কাতর হয়। মাতৃহীন একজন ছাত্র ছানাটির এই কষ্ট আর মা-চড়ুইয়ের আর্তনাদে কাতর হয় এবং মই এনে ছানাটিকে পাখির বাসায় তুলে দেয়। কবি বলেছেন, এতে মা-চড়ুইয়ের আশীর্বাদের যে নীরবধারা প্রবাহিত হয়, সারা পৃথিবীতে এর তুলনা হতে পারে না। এছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভোলানাথ স্বর্ণকার ও হরিশঙ্কর মিশ্রের বিদায় উপলক্ষে রচিত যথাক্রমে 'করুণ গাথা' ও 'করুণ বেহাগ' নামে দুটো কবিতা পাওয়া যায়। 'করুণ গাথা' খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দিনের *যুগস্রষ্টা নজরুল* গ্রন্থে এবং 'করুণ বেহাগ' ১৯৫৩ সালে ঈদ সংখ্যা সাপ্তাহিক *ওয়াতান* পত্রিকায় প্রকাশ পায়। [কাদির, ১৯৯৩(গ) : ১০৩৩] 'করুণ বেহাগ' কবিতায় ছাত্র-নজরুল শিক্ষকের বিদায় সম্পর্কে বন্ধুদের লক্ষ করে বলেছেন: 'নে ভাই চক্ষে বসন চাপিয়া, অথবা উপাড়ি দে, / চলে যান আজি মোদের একটি শ্রেষ্ঠ গুরু যে রে!' [কাদির, ১৯৯৩ (গ) : ৩৯০] লক্ষণ ও ধারা থেকে অনুমান করা যায়, এরকম অনেক লেখা লিখেছিলেন নজরুল, যেগুলো আজ হারিয়ে গেছে, কল্পনার উপাদান হিসেবে শুধু অনুমানই করা চলে। তাই নজরুলের প্রথম রচনা কোনটি আজ তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন; বলা চলে অসম্ভব। তবে, একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে, বিদ্যালয়ে থাকাকালেই লেখার একটি ধারাবাহিকতা তৈরি হয় তাঁর।

প্রথম প্রকাশিত রচনা

নজরুল যখন সিয়ারসোল রাজ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুকে অবলম্বন করে কবিতা লেখেন। কবিতাটির শিরোনাম তিনি দিয়েছিলেন 'ক্ষমা'। কিন্তু পরে এই শিরোনামটির বদলে 'মুক্তি' নাম দেন মুজফ্ফর আহমদ। (হক, ২০১০ : ৫) কবিতার নিচে লেখা আছে: "ইহা সত্য ঘটনা। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই দরবেশের কথিত-রূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পবিত্র সমাধি এখনও 'হাত-বাঁধা ফকিরের মাজার শরিফ' বলিয়া কথিত হয়।" (কাদির, ১৯৯৩ (খ) : ৫০৮) দীর্ঘ এই কবিতার মূলকথা হলো: রানিগঞ্জের অর্জুনপটির রাস্তার তেমাথায় নিমগাছের নিচে হঠাৎ এক দরবেশ এসে আস্তানা গড়েন এবং সবার দৃষ্টি কাড়েন। যে নিমগাছে পাতাই গজাতো না, সে গাছ আবার পাতায় ভরে ওঠে। কিন্তু ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের কোনো এক ভোরে মালবোঝাই গরুগাড়ি বেসামাল হয়ে উঠে পড়ে দরবেশের উপর। এতে তাঁর পাঁজরের হাড় ভেঙে তিনি মুমূর্ষু হয়ে পড়েন। পুলিশ গাড়োয়ানকে আটক করে; লোকজনও তাকে প্রহার করে। এসব দেখে দরবেশ পুলিশকে বলেন, গাড়োয়ানকে ক্ষমা করতে। কারণ, গাড়োয়ানকে আটক করলে তার পরিবার ও গরুগুলো অনাহারে থাকবে। গাড়োয়ানকে বরং অর্থসাহায্য করার জন্য পুলিশকে পরামর্শ দেন সেই দরবেশ। এভাবেই তাঁর ক্ষমাগুণ প্রকাশ পায় এবং এখানেই কবিতাটি শেষ হয়। এই কবিতায় দরবেশের আধ্যাত্মিকতার চেয়ে ইহজাগতিক ক্ষমাগুণই প্রকাশ করেছেন নজরুল। তাই এই কবিতার শিরোনাম 'ক্ষমা' হওয়াই যথ যথ ছিল। মুজফ্ফর আহমদ নাম পালটে 'মুক্তি' দেওয়ায় এর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব যুক্ত হয়, যা এই কবিতার মূলচেতনা নয়। নজরুল জীবনের শুরু থেকেই যে ইহজাগতিক গুণাবলির সমাদর করেছেন

এবং জীবনভর তা লালন ও প্রকাশ করে গেছেন, এ কবিতার 'ক্ষমা' নামকরণই সে ইঙ্গিত মেলে। এই কবিতাটিই নজরুলের কোনো পত্রিকায় ছাপাবর্ণে মুদ্রিত প্রথম কবিতা। মোজাম্মেল হক ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত কলকাতা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*'র শ্রাবণ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ (১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ) সংখ্যায় 'মুক্তি' ছাপা হয়। (কাদির, ১৯৯৩ খ : ৯০২) পরে কবির *নির্ঝর* (১৩৪৫) কাব্যগ্রন্থভুক্ত হয় কবিতাটি। পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ। এসময় কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন করাচিতে। তিনি ৪৯ বাঙালি ডিভিশনের ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম হিসেবে করাচি সেনানিবাস থেকে ডাকযোগে কবিতাটি প্রেরণ করেছিলেন। তখনো নজরুল ইসলামের সঙ্গে মোজাম্মেল হক বা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অথবা মুজফ্ফর আহমদের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি। করাচি সেনানিবাসে বসে লেখা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত *সওগাত* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় ছাপা হয়। (হক, ২০১০ : ৮) মাসিক সাহিত্যপত্র *সওগাত* প্রকাশ হতো কলকাতা থেকে। এটিই কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত রচনা। নজরুল এটিকে তাঁর ছোটোগল্প গ্রন্থ *রিক্তের বেদন*-এ (১৯২৪) স্থান দেন। ছোটোগল্প হিসেবে একে গ্রহণের ক্ষেত্রে সমালোচকদের মধ্যে দ্বিধা লক্ষ করা যায়।[২] 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'র আগে নজরুলের আর কোনো লেখা মুদ্রিত হওয়ার প্রমাণ নেই।[৩] লেখাটি আকর্ষণীয় এবং কোনো লেখকের প্রথম প্রকাশিত রচনা হিসেবে ঈর্ষণীয়। এটি ছোটোগল্প না হলেও নজরুলের ভাষা এখানে খুবই গতিশীল। পক্বলেখকের মতো শব্দের গাঁথুনি তাঁর। লেখক এর ভূমিকায় জানান: তিনি করাচির বাঙালি পল্টনে থাকাকালে এক যুবক তাঁর কাছে আত্মকাহিনি বর্ণনা করে, যে পরে বাগদাদে গিয়ে যুদ্ধে নিহত হয়। সে গল্পটিই তিনি পরিবেশন করেছেন। সেখানে নজরুল ইসলাম লিখেছেন, আত্মকাহিনির ছেলেটি কিশোর বয়স থেকেই দুরন্ত ছিল। দুরন্ত ছেলেটিকে শান্ত করার 'ঔষধ' হিসেবে অভিভাবকেরা তার আঠারো বা উনিশ বছর বয়সে তেরো বছরের এক বালিকা রাবেয়ার সঙ্গে বিয়ে দেন। কিন্তু রাবেয়া অকালে মারা যায়। এরপর তাকে আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় সখিনা নামের এক নারীর সঙ্গে। রাবেয়ার প্রতি কিশোরটির আকর্ষণ ছিল প্রবল। কথক বলেছে: 'সেই যে আঘাত পেলুম, তাতেই আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। আমি আর উঠতে পারলুম না।' (কাদির, ১৯৯৩ ক : ৬৭৯) তাই নিজে অনেক চেষ্টা করার পরও সখিনাকে সে ভালোবাসতে পারেনি। তার কাছে মনে হয়েছে, এ-যে হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিনয়। এ অবস্থায় কথক সামাজিকভাবে বিপথে পরিচালিত হতে থাকে আর তাই তার পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। তারপরই সখিনা ও কথকের মায়ের মৃত্যু হয়। এভাবে সব এলোমেলো হয়ে যায়! অবশেষে ভাঙা সংসার ছেড়ে সে চলে আসে যুদ্ধে। এখানে যেহেতু বিদ্যালয়ের নাম রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুল, কথক সৈনিকজীবন গ্রহণ করে ইত্যাদি আছে, সেহেতু এটিকে অনেকেই নজরুলের আত্মজৈবনিক রচনা বলেছেন। মোটকথা, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'-ই কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত রচনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ায় ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে পাকাপাকিভাবে করাচি ছেড়ে নজরুল কলকাতায় চলে আসেন। (হক, ২০১০ : ৯) এরপর ধীরে ধীরে চলে তাঁর নানা ধরনের রচনা এবং প্রকাশ হতে থাকে গ্রন্থাবলি। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম *ব্যথার দান* (প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯২২)– গল্পগ্রন্থ; দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থের নাম *অগ্নিবীণা* (প্রকাশ: অক্টোবর ১৯২২)– কাব্যগ্রন্থ। দুটোই বের হয়েছে কলকাতা থেকে।

পূর্ববঙ্গে প্রথম প্রকাশিত রচনা

করাচি থেকে এসে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করা শুরু করেন কাজী নজরুল ইসলাম। এরপর অনেকবারই পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এসেছেন তিনি। অবশ্য বেড়াতে, অতিথি হয়ে– বাস করতে নয়। নজরুলের জীবনে বসবাসের পরিধিটি ছিল পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিকই: বর্ধমান-কলকাতা-দেওঘর-হুগলি-কৃষ্ণনগর-কলকাতা। বাংলাদেশে তিনি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, দিনাজপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, যশোর, খুলনা, পাবনা, কুষ্টিয়া, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকাসহ বহু জায়গায় গেছেন, বলেছেন, রাত্রিবাস হয়েছে, মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে দারোগা কাজী রফিজউল্লাহর সঙ্গে ময়মনসিংহের ত্রিশালে আগমনই কাজী নজরুল ইসলামের বাংলাদেশে প্রথম আগমন। তখন তাঁর বয়স পনেরো বছর। সেখানে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও একই বছর তিনি ময়মনসিংহের ত্রিশাল ত্যাগ করেন। এরপর ত্রিশালে তিনি আর ফেরেননি। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর পরেই ময়মনসিংহের সাময়িক পত্রিকায় নজরুলের লেখাপ্রকাশ হয়। নজরুল যখন রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র, তখন তিনি নরোত্তম রাজার ঢিপি নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন বলে নজরুলের বন্ধু ও কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর *আমার বন্ধু নজরুল* গ্রন্থে উল্লেখ করেন। সেই কবিতাটি 'ভগ্নস্তূপ' শিরোনামে ময়মনসিংহের মাসিক *পল্লিশ্রী* পত্রিকায় আশ্বিন, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় প্রকাশ হয়। (কাদির, ১৯৯৩ গ : ১০৩৩) চুয়ান্ন পঙ্‌ক্তির নিখুঁত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা বড়ো এই কবিতাটি মূলত একটি কিংবদন্তিকে কেন্দ্র করে লিখিত। চুরুলিয়া গ্রামে পুরোনো একটি বড়ো মাটির ঢিপি আছে। কথিত আছে, নরোত্তম নামে এক হিন্দু রাজা ছিলেন সেখানে। তাঁর সুখের রাজ্যে একদিন আক্রমণ করে বর্গির দল। পুড়িয়ে দেয় রাজপ্রাসাদ, রাজত্ব। সেই থেকে সবকিছু ঊষর, মাটির ঢিপিতে পরিণত। শুধু একটি জীবন্ত শিমুলগাছ সব কিছু অস্বীকার করে তখনো 'জেগে' ছিল। লক্ষ করার ব্যাপার, 'ক্ষমা' (পরে যার নামকরণ হয় 'মুক্তি') কবিতায় আছে নিমগাছের কথা, 'ভগ্নস্তূপ' কবিতায় আছে শিমুলগাছের কথা। এখানে নজরুলের চেতনাতে নিসর্গপ্রকৃতি যেন জীবনধারণের প্রতীক হয়ে ওঠে।

তবে পূর্ববঙ্গ ভূখণ্ডে নজরুলের কবিতা প্রথম ছাপা হয় সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত ইসমাইল হোসেন সিরাজী সম্পাদিত মাসিক *নূর* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ সংখ্যায়। কবিতার শিরোনাম: 'কালোর উকিল'। তবে কবিতাটি নজরুল তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি। *নূর* পত্রিকা কিন্তু এর আগেই নজরুলের ছোটোগল্প প্রকাশ করে। বিশেষ করে, *নূর* সূচনা-সংখ্যায় (মাঘ, ১৩২৬) নজরুলের ছোটোগল্প 'মেহের-নেগার' ছাপা হয়। সেদিক থেকে 'মেহের-নেগার' তৎকালীন পূর্ববঙ্গে নজরুলের প্রকাশিত প্রথম ছোটোগল্পই শুধু নয়, প্রথম লেখাও। 'মেহের-নেগার' প্রবাস-পটভূমিতে ত্রিভুজ প্রেমের গল্প। ওয়াজিরিস্তানের য়ুসোফ এই গল্পের নায়ক। আফগানিস্তানের পটভূমিতে রচিত গল্পটিতে মেহের-নেগার নামের নায়িকাই হয়ে ওঠে নামকেন্দ্র। য়ুসোফ মেহেরকে ভালোবাসে, আবার তাকে হারিয়েও ফেলে। খুঁজতে যায় ঝিলমের তীরে। আমাদের মনে পড়ে 'বলাকা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঝিলম নদীর চমৎকার তুলনা দিয়েছিলেন বাঁকা তলোয়ারের সঙ্গে। সেটি ছিল ভারত-অংশের ঝিলম। নজরুলে পাওয়া গেল ঝিলম নদীর আফগানিস্তান অংশ। আফগানিস্তানের ঝিলম তীরে মেহেরকে খুঁজতে গিয়ে গুলশানের দেখা পায় য়ুসোফ। কিন্তু গুলশান সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় রূপজীবিনী বা বাইজি খুরশিদানের মেয়ে। এই পরিচয় অবশেষে য়ুসোফ ও গুলশানের মিলনে বিঘ্ন ঘটে।

কারণ গুলশান নিজেকে যোগ্য মনে করে না। মায়ের পেশার দায় সে নিজে নিতে চায়। এমন ঘটনা বা মা-সন্তান অতীতকালে, অর্থাৎ সামন্তবাদী সমাজে প্রচুর ছিল। গুলশান যেন সে প্রতিনিধিত্বই করে। য়ুসোফের প্রেমে সাড়া না দিয়ে গুলশান আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। প্রেমিকার বিয়োগব্যথা ভুলতে একদিন য়ুসোফ যুদ্ধে চলে যায়। গল্পের শেষে আবার ঝিলম নদীর প্রসঙ্গ আছে। সেখানে কোনো এক গায়ক করুণ কণ্ঠে গানে নিয়েছে গুলশানের নাম। ঝিলম নদীর তীরে মেহের-নেগারকে খুঁজতে এসে গুলশানের দেখা মিলেছিল আবার ঝিলমই তার মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে রইল। কিন্তু গুলশানের কবরে লেখা ছিল: ওগো পথিক, এক বিন্দু অশ্রু ফেল। শরীর অপবিত্র কিনা কে বলবে, ভালোবাসা কিন্তু পবিত্র। প্রেমিকের উদ্দেশে লেখা– সে যদি আসে তবে যেন না কাঁদে। এই হৃদয়ছোঁয়া ছোটোগল্পটি প্রথম প্রকাশ পায় পূর্ববঙ্গের সিরাজগঞ্জ থেকে। একই পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ববঙ্গে প্রথম ছাপা হওয়া নজরুলের কবিতা 'কালোর উকিল' সেদিক থেকে বরং বেশ হালকা মেজাজের। গাত্রবর্ণে কালো এক যুবক বিয়ে করে সুন্দরী মেয়েকে। সেটা দেখে পাড়ার বৌদিরা ঠাট্টা করে বলে, দাঁড়কাকের ঠোঁটে পাকা ডালিম; কৃষাণবধূরা বলে, বানরের হাতে বেগুন। কিন্তু সুন্দরী বধূটি এতে মোটেও ভেঙে পড়ে না। বরং বলে, ভোমরা-কাজল-কোকিল সবইতো কালো আর সুন্দর! এই কথায় কালো কোকিল কূজন করে সমর্থন জানালে সেই কৃষ্ণকায় যুবক 'ফি' হিসেবে চুম্বন দিয়ে কোকিলের উদ্দেশে বলে ওঠে: 'সাবাস উকিল!' (কাদির, ১৯৯৩ গ : ৩৯২) বারো পঙ্‌ক্তির হালকা মেজাজের এই কবিতাটিই পূর্ববঙ্গে নজরুলের প্রকাশিত প্রথম কবিতা।

ঢাকায় প্রথম প্রকাশিত রচনা

ঢাকায় নজরুল প্রথম আসেন ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে। সেটাও কোনো অতিথির সম্মানে নয়, রাজনৈতিক কর্মের দায় ও প্রেরণায়। ততদিনে (১৯২৫) নজরুল হেমন্তকুমার সরকার, আবদুল হালিম, কুতুবুদ্দিন আহমদ প্রমুখের সঙ্গে 'শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যে দলের উদ্দেশ্য ছিল: নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভ। এই দলের কর্মসূচি নিয়ে অবিভক্ত বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় জেলে-মজুর-চাষিদের সংগঠিত করতে নজরুল এসময় বেরিয়ে পড়েন। সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে নজরুলের বসবাসই ছিল কৃষ্ণনগরে, যেখানে হেমন্তকুমারের বাড়ি। কৃষ্ণনগর থেকে হেমন্তকুমারসহ এসময় একাধিকবার আজকের বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক বৈঠক ও সভা করতে আসেন তিনি। যেমন, ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দেই জানুয়ারিতে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত কৃষক-শ্রমিক সম্মেলনে তিনি অসুস্থতার জন্য আসতে না পেরে লিখিত বক্তব্য পাঠান; মার্চে দিনাজপুর ও মাদারীপুরে; এপ্রিলে চাঁদপুর ও সিলেটে কয়েকটি সভায় অংশ নেন। তিনি এরপর আসামের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাতেও যান। এরপর যান ঢাকায়; তারপর চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে। তখন কিন্তু নজরুল ইসলাম শুধু 'নজরুল' বা 'দুখু মিয়া' নন– বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম! এর মধ্যে নজরুলের গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ মিলে বারোটি গ্রন্থ (*ব্যথার দান, অগ্নিবীণা, যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, দোলনচাঁপা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, রিক্তের বেদন, চিত্তনামা, ছায়ানট, পূবের হাওয়া, সাম্যবাদী*) বেরিয়ে গেছে, *ধূমকেতু* পত্রিকাসহ কয়েকটি বই সরকার বাজেয়াপ্তও করেছে[৪], কলকাতার পত্রিকাগুলো নজরুলের লেখা পাবার জন্য তাঁর পিছু ছাড়ছে না, পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো পত্রিকাতেও নজরুলের লেখা বের হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করছেন নজরুল। অথচ দেখা যাচ্ছে, ১৯২৬-এর আগে পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় কোনো লেখাই ছাপা হয়নি নজরুলের, বইতো দূরে থাক! এই ঢাকা আজকের শহর বা জেলা ঢাকা নয়, তৎকালীন ঢাকা, যেখানে মানিকগঞ্জ, গাজীপুর (জয়দেবপুর), নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ (বিক্রমপুর) অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক জেলা ঢাকা থেকে উল্লিখিত স্থানগুলো বিচ্ছিন্ন করে পৃথক জেলার মর্যাদা দান করা হয়।

ময়মনসিংহের *পল্লিশ্রী*, সিরাজগঞ্জের ইসমাইল হোসেন সিরাজী সম্পাদিত *নূর* ছাড়াও পূর্ববঙ্গের বেশ কয়েকটি পত্রিকায় নজরুলের লেখাপ্রকাশের তথ্য মেলে। এর মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আবদুর রশীদ সিদ্দিকী সম্পাদিত *সাধনা*, ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত সৈয়দ আবদুর রব সম্পাদিত *মোয়াজ্জিন* ইত্যাদি পত্রিকা। কিন্তু এর মধ্যে ঢাকার নাম নেই। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে কাজী নজরুল ইসলাম মূলত রাজনৈতিক প্রয়োজনেই হেমন্তকুমার সরকারসহ শহর ঢাকায় আসেন এবং ডা. মোহিনীমোহন দাশের ঢাকা-আদালত পাড়ার বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করেন। ডা. মোহিনীমোহন দাশ ছিলেন তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দলের নেতা। নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছেন, এই সংবাদ জানার পর তরুণ আবদুল কাদির, মোহাম্মদ কাসেম, আবদুল মজিদ প্রমুখ গিয়ে নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। (কাদির, ১৯৮৯ : ৩৪) এটাই ছিল নজরুলের সঙ্গে এই ব্যক্তিদের প্রথম সাক্ষাৎ। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র উদ্যোক্তাদের অনুরোধে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে জুন হেমন্তকুমার সরকারসহ কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে তাঁদের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কেন প্রয়োজন এ নিয়ে বক্তব্য দেন ও সংগীত পরিবেশন করেন। মোহাম্মদ কাসেমের জন্ম কুমিল্লাতে, ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম জীবনে ঢাকার চকবাজারে একটি মনিহারি দোকানের কর্মচারী ছিলেন, পরে নিজেই মনিহারি দোকান দিয়ে নেন। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক থাকায় আবদুল কাদির, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সে সূত্রেই তিনি 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র সঙ্গেও যুক্ত হন। তিনি নিজে একটি সাহিত্যপত্রিকা বের করবেন বলে ভাবছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে মোহাম্মদ কাসেম সেই ইচ্ছের কথা কবিকে বলেন এবং তাঁর লেখা একটি কবিতা প্রকাশিতব্য সাহিত্যপত্রিকার জন্য কবির কাছে প্রার্থনা করেন। (কাইউম, ২০০৮ : ১৪১) বয়ঃকনিষ্ঠ মোহাম্মদ কাসেমের অনুরোধ কবিকে আকৃষ্ট করেছিল নিশ্চয়ই। সে যাত্রায় কয়েকদিনের মধ্যেই কবি আজিজুল হাকিমের অনুরোধে শহর ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে এক সংগীত আয়োজনে যোগ দেন নজরুল। এসময় নারায়ণগঞ্জে অবস্থানকালে নজরুল 'অভিযান' নামে একটি কবিতা লেখেন এবং কবিতার নিচে স্থান ও তারিখ লেখেন: 'নারায়ণগঞ্জ ২-৭-২৬'। (কাদির, ১৯৯৩ ক : ৩৬৭) উল্লেখ্য, কবি আজিজুল হাকিমও নজরুলের থেকে বয়সে আট বছরের ছোটো ছিলেন এবং পরে নার্গিস আসার খানমের (সৈয়দা খাতুন) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। আজিজুল হাকিমের মাধ্যমে এরপরেও নারায়ণগঞ্জে নজরুল সংগীত আসরে উপস্থিত হওয়ার জন্য পত্রাদি লিখেছেন, সে দৃষ্টান্ত আছে। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ সংগীত-সংসদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিকে নজরুল-লিখিত এ ধরনের একটি পত্র বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *নজরুল রচনাবলি*'তে মুদ্রিত আছে। সেখানেও আজিজুল হাকিমের 'দৌত্যের কথা' নজরুল উল্লেখ করেছেন। নারায়ণগঞ্জে সংগীত আয়োজনে গিয়ে লেখা 'অভিযান' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলাম মোহাম্মদ কাসেমকে তাঁর প্রকাশিতব্য সাহিত্যপত্রিকার জন্য প্রদান করেন। এই কবিতা পাবার পর মোহাম্মদ কাসেম এতটাই আনন্দিত ও আবেগায়িত হয়ে পড়েন

যে, পরের মাসেই (আগস্ট) তিনি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তার নাম দেন *অভিযান*। অর্থাৎ *অভিযান* নামকরণটিও কাজী নজরুল ইসলামের লেখা থেকে গৃহীত। নজরুলের 'অভিযান' কবিতা মুদ্রণের মাধ্যমে সাহিত্যপত্রিকা *অভিযান* ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (আগস্ট, ১৯২৬) আত্মপ্রকাশ করে। শুধু তাই নয়, পত্রিকার লোগো বা নামাঙ্কন ছাপার নিচে নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতার *তিমির রাত্রি*– থেকে ছয় পঙ্‌ক্তি ছাপা হয়। নজরুল তখন সম্প্রীতির ডাকযুক্ত এই কবিতাই সর্বত্র পাঠ ও গানের মাধ্যমে পরিবেশন করছিলেন।

'মাসিক' বলে অভিহিত হলেও সাহিত্যপত্রিকাটি ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুটো সংখ্যার বেশি আর বের হয়নি। কারণ, এরপর সম্পাদক বিয়ে করেন, জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে চলে যেতে হয় কলকাতায়। অবশ্য পরে তিনি আবার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। 'অভিযান' কবিতা লেখা হয়েছিল নারায়ণগঞ্জে, কিন্তু সাহিত্যপত্রিকা *অভিযান* প্রকাশ হয় শহর ঢাকা থেকেই। পত্রিকার কার্যালয় ছিল ৮ নম্বর মিটফোর্ড রোড, ঢাকা। এটির মুদ্রণকার ছিলেন শেখ রসুল বক্স এবং ছাপাখানা ছিল ঢাকার রহমানিয়া প্রেস। (হক, ১৯৮৪ : ১৪৬) মোহাম্মদ কাসেমের জন্ম কুমিল্লায় হলেও তাঁদের আদি নিবাস ছিল ঢাকাতেই। তিনি যে মনিহারি দোকানের কর্মচারী ছিলেন সেটি ছিল ঢাকার চকবাজারে। নিজে যে দোকান দিয়েছিলেন সেটি মোগলটুলিতে। সেটিতে ব্যর্থ হয়ে তিনি মোগলটুলির আর একটি বইয়ের দোকানে কাজ নেন। পরে রহমতগঞ্জের হাজি পিয়ার বক্সের কন্যা খায়রুন্নেসাকে বিয়ে করেন। সেখান থেকে দ্বিতীয়বারের মতো (১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি কলকাতায় যান জীবিকার সন্ধানে। ফলে শহর ঢাকাকেন্দ্রিকই ছিল মোহাম্মদ কাসেমের বিচরণক্ষেত্র এবং *অভিযান* পত্রিকা শহর ঢাকা থেকেই প্রকাশ হয়েছে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধ 'সম্মোহিত মুসলমান'; আবুল হুসেনের প্রবন্ধ 'নিষেধের বিড়ম্বনা'; হেমন্তকুমার সরকারের প্রবন্ধ 'অভিযান'; আবদুল কাদিরের কবিতা 'বোধন'; মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কবিতা 'যাত্রা সঙ্গীত'; বুদ্ধদেব বসুর কবিতা 'শ্রাবণ বেদন'; জসীমউদ্‌দীনের কবিতা 'অস্ফুট বেদন'; সুফিয়া কামালের কবিতা 'ঝড়ের রাতে'; অনুলিখিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে প্রদত্ত (১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬) রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ইত্যাদি।

মোহাম্মদ কাসেম সম্পাদিত *অভিযান* কোনো গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা হিসেবে ইতিহাসে স্থান করতে পারেনি সত্য, কিন্তু এই পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা মুদ্রিত হওয়ার কারণে তা ইতিহাসের বাইরেও থাকে না। বিশেষ করে, যে পত্রিকাটি পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা প্রথম প্রকাশকারী হিসেবে স্বীকৃতি পায়, তার একটি ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে। এই কবিতার মূলকথা হলো: মানবতা রক্ষায় তরুণদের দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে আসতে হবে। এটাকেই কবি 'অভিযান' বলেছেন। বলেছেন, নতুন পথের পথিকেরা অর্থাৎ তরুণেরা কণ্ঠে 'মানুষ মহীয়ান' ধ্বনি তুলে এগিয়ে এসো। ভীরুরা থাকুক। যুদ্ধসাজ পরবারও এখন সময় নেই। উদোম গায়েই বেরিয়ে আসতে হবে বাইরে, আর তাহলেই মানবতা রক্ষা পাবে। চারদিকে চেতনারোধী অন্ধকার নেমে এসেছে। মানবতার মশাল জ্বেলে এগিয়ে এলেই নতুন প্রভাত আসবে। তাই 'জয় নব উত্থান' বলে নবপ্রভাতের গান গাইতে হবে তরুণদের। কাজী নজরুল ইসলামের এই কবিতার মূলভাব ঐসময় তিনি যে লেখাগুলো লিখছিলেন বা বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবদুল কাদিরের স্মৃতিচারণ স্মরণ করলে জানা যায়: "আমরা নজরুলকে নিয়ে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র একটা বৈঠক করি। সেই বৈঠকে নজরুল এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, তিনি এক মাস আগে ২২শে মে তারিখে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গেয়ে; কিন্তু কেউ হুঁশিয়ার হচ্ছেন না, এই অবস্থায় তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে যে, যদি সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রবলতর হতে থাকে তাহলে সমগ্র দেশে ভয়াবহ বিপর্যয় ও ভাঙ্গন দেখা দেবে। তিনি তারপর 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'আমরা ছাত্রদল', 'কৃষাণের গান' প্রভৃতি কয়েকটি জনজাগরণমূলক গান গেয়ে অনুরাগীদের আনন্দ দান করেন।" (কাদির, ১৯৮৯ : ৩৫) আবদুল কাদিরের এই স্মৃতির সঙ্গে 'অভিযান' কবিতাটি সৃষ্টির ধারাবাহিকতা আছে নিঃসন্দেহে। কবিতাটি নজরুল তাঁর *সিন্ধু-হিন্দোল* (১৩৩৪) কাব্যগ্রন্থে কোনো রকমের পরিবর্তন ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত করেন। ঢাকায় নজরুলের লেখা প্রকাশে বেশ বিলম্ব হলেও মানবতার বাণীবহ তাঁর এমন একটি অমর কবিতার প্রথম প্রকাশের স্থান হিসেবে জড়িয়ে আছে আজকের ঢাকার নাম, নিঃসন্দেহে এটা শ্লাঘার ব্যাপার।

টীকা

১. বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত (নতুন সংস্করণ ১৯৯৩) *নজরুল রচনাবলি* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান' শিরোনামে এই কবিতাগুলো মুদ্রিত আছে এবং পাদটীকায় কবিতা-সংক্রান্ত সম্পাদকভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

২. *কথাশিল্পী নজরুল* (১৯৭৫) গ্রন্থে রাজিয়া সুলতানা সৈয়দ আলী আশরাফের একটি ইংরেজি প্রবন্ধের ('Homage to Kazi Nazrul Islam') উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, আলী আশরাফ 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'কে বলেছেন 'Semi auto-biography'। তিনি নিজেও বলেছেন, 'একে গল্প বা কথিকা না বলে স্কেচধর্মী রচনা বলাই ভালো।' (পৃ. ৯১)

৩. আবদুল কাদির তাঁর সম্পাদিত বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত (নতুন সংস্করণ ১৯৯৩) *নজরুল রচনাবলি* প্রথম খণ্ডের 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা। (পৃ. ৯৩৩)

৪. *ধূমকেতু* পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হয় ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর; প্রথম গ্রন্থ হিসেবে *বিষের বাঁশী* কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয় ২২শে অক্টোবর, ১৯২৪। এরপর তাঁর বাজেয়াপ্তকৃত গ্রন্থাবলি হলো: *ভাঙার গান*, *প্রলয় শিখা*, *চন্দ্রবিন্দু*, *যুগবাণী*।

তথ্যসূত্র

১। কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল (২০০৮), *ঢাকার ইতিবৃত্ত : ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা

২। কাদির, আবদুল (১৯৮৯), *নজরুল-প্রতিভার স্বরূপ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

৩। কাদির, আবদুল (১৯৯৩ক), *নজরুল রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৪। কাদির, আবদুল (১৯৯৩খ), *নজরুল রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৫। কাদির, আবদুল (১৯৯৩গ), *নজরুল রচনাবলী* তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৬। মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ (১৩৭৫), *আমার বন্ধু নজরুল*, ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা

৭। সুলতানা, রাজিয়া (১৯৭৫), *কথাশিল্পী নজরুল*, মুখদুমী এন্ড আহসানউল্লাহ লাইব্রেরি, ঢাকা

৮। হক, খোন্দকার সিরাজুল (১৯৮৪), *মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৯। হক, মাহবুবুল (২০১০), *নজরুল তারিখ অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা ও জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড: একটি পর্যালোচনা

ড. মো. আব্দুস সামাদ

> ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা... আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়। –বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ প্রদান করেছেন। এ ভূখণ্ডের জনমানুষের চিন্তা-চেতনা আর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাঙালি জাতির স্বাধীনতার অগ্রদূত। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে হয়ত আজও এদেশের মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারত না এবং পরাধীনতার শেকলে আজও আবদ্ধ থাকত। পাকিস্তানি শত্রুদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে নিজের জীবন বাজি রেখে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু। পৃথিবীতে যত মহান ব্যক্তিত্ব রয়েছেন তাঁদের তালিকায় বঙ্গবন্ধুর নাম রয়েছে প্রথম সারিতে। তাঁর অসামান্য নেতৃত্বের দক্ষতার মাধ্যমে তিনি দেশের সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং দেশ স্বাধীন করার জন্য জীবন বাজি রেখে লড়াই করে গেছেন শত্রুদের বিরুদ্ধে। ছিনিয়ে এনেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং আমাদের উপহার দিয়েছেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আমরা পেয়েছি একটি নতুন পতাকা, নতুন মানচিত্র এবং স্বাধীনতার স্বাদ। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন সামনে নিয়ে দীর্ঘ চব্বিশটি বছর সংগ্রাম পরিচালনা করে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হন তিনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন মানুষের হৃদয়ে মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী গৌরবগাথা অম্লান থাকবে। তিনি এমন একজন মহামানব, যাঁর হৃদয় ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ। যে যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি, সেই যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে একটি দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের মহামানব, দুনিয়ার নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। পৃথিবীতে কত নেতা এসেছেন, আসবেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো এমন বিশাল হৃদয়ের অধিকারী মানুষ দুর্লভ।

অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য ও ইচ্ছাকে রাজনীতির মাঠে বরাবরই উন্মুক্ত রেখেছিল বঙ্গবন্ধু। অস্বচ্ছ, অস্পষ্টতা আর অন্ধকার এড়িয়ে চলেছেন স্বভাবজাত নিত্য আচরণে। তিনি মুক্ত, সুস্পষ্ট ও স্পষ্টবাদিতার আদর্শ ধারণ করতেন সব সময়। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, মুক্তমনা ব্যক্তিত্ব। প্রথাগত রীতি ভেঙে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনই ছিল অভীষ্ট লক্ষ্য। বাঙালির হাজার বছরের চিরায়ত রূপ ও সংস্কৃতিকে তিনি রাষ্ট্রীয় অবয়বে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। আর এখানেই বঙ্গবন্ধুর সার্থকতা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাথে বঙ্গবন্ধুর নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বীজ রোপণ করেছিলেন। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সেদিন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বাংলা ভাষাকে পূর্ববঙ্গের লেখার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হোক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা হোক।'

তিনি ক্ষমতার জন্য, ক্ষমতায় থাকার জন্য, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য রাজনীতি করেননি। প্রিয় মাতৃভূমিকে পাকিস্তানি শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করে বাঙালিরা যাতে বাংলাদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে সেজন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতেই তিনি রাজনীতি করেছেন। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও, শুরু থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিদ্যমান ভিন্নতাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যা বর্তমানে বাংলাদেশ, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্যসমূহ দিন দিন প্রকট রূপ ধারণ করে। এসব কারণে মানুষ বরাবরই নিজেদের মুক্ত দেশের মুক্ত নাগরিক হিসেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করতে থাকে। এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর রয়েছে বিশাল অবদান। জনগণের জন্যই ছিল তাঁর রাজনীতি ও কর্মসূচি। বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'আমাকে মোনেম খান কাবু করতে পারেনি, এমনকি আইয়ুব খানও পারেনি– কিন্তু আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে আপনাদের এই অকুণ্ঠ ভালোবাসা। আপনারা দোয়া করবেন যেন আপনাদের এই ভালোবাসার মর্যাদা দিতে পারি।' বাংলার মানুষের প্রতি ভালোবাসার মর্যাদা দিতে তিনি একাই রক্ত দেননি, সপরিবার রক্ত দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করে গেছেন।

১৯৬৬-এর ছয় দফার ভেতরেই জেগে ওঠে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। এর শেষ পরিণতি ছিল মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ইতিহাসের সোপান বেয়ে বাঙালির ভালোবাসা থেকে 'বঙ্গবন্ধু' হয়েছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করে, অপবাদ ছড়িয়ে ইতিহাসকে আড়াল করা সম্ভব নয়। ইতিহাস সৃষ্টি হয় অনেক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। বাংলার মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগের ইতিহাস তাঁর অমরত্বই নিশ্চিত করছে। ১৯৭১-এর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছেন। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে জাতীয় মুক্তির মোহনায় দাঁড়

করিয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই সাতই মার্চের ভাষণ ছিল আমাদের পাথেয়। সাতই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দান হয়ে ওঠে এক জনসমুদ্র। মুহুর্মুহু গর্জনে ফেটে পড়ে জনসমুদ্র, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে একই আওয়াজ– স্বাধীনতার বজ্র শপথ। বাতাসে উড়ছে অসংখ্য পতাকা, সোনার বাংলার মানচিত্র আঁকা লাল সূর্যের পতাকা, স্লোগানের সাথে সাথে উত্থিত হচ্ছে আকাশের দিকে বাঙালির সংগ্রামের প্রতীক বাঁশের লাঠি, অসংখ্য লাঠি। মঞ্চে মাইক থেকে স্লোগান দিচ্ছেন সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রলীগের নেতারা। এই স্লোগানে স্লোগানে উদ্দীপ্ত হচ্ছে জনসমুদ্র– 'জয় বাংলা', 'আপোশ না সংগ্রাম– সংগ্রাম সংগ্রাম', 'আমার দেশ তোমার দেশ– বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'পরিষদ না রাজপথ? রাজপথ রাজপথ', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর– বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়– বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। ১৯৭১ সালের সাতই মার্চ অপরাহ্নে রমনা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণ শুধু ঐতিহাসিক নয়, যুগান্তকারীও বটে। এই ভাষণের মধ্যে ছিল হাজার বছর বহিরাগত দ্বারা শাসিত, শোষিত ও পদানত একটি হতভাগ্য জাতির জাগরণ ও মুক্ত হবার জন্য সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান। বস্তুতপক্ষে সাতই মার্চের ভাষণ ছিল বাংলার স্বাধীনতার ঘোষণা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা। এ কারণেই বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণগুলোর অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধের কালপর্বে বন্দি থাকলেও তাঁর উপস্থিতি ছিল আমাদের হৃদয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চ ১৯৭১-এর ইতিহাসে অনন্য ভাষণটি অধিকারবঞ্চিত বাঙালির শত সহস্র বছরের সংগুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের উচ্চারণে সমৃদ্ধ। ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রারম্ভে তিনি বলেছিলেন, 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' তাঁর এই শেষ বার্তা হৃদয়ে ধারণ করে হাতিয়ার তুলে নিয়ে নয় মাস যুদ্ধ করে ১৬ই ডিসেম্বর দেশকে হানাদার মুক্ত করেও আমরা স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করতে পারিনি। ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি যেদিন তিনি স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন, সেদিন মনে হয়েছে আজ আমরা প্রকৃতই স্বাধীন। বাঙালি আর বাঙালিত্বের নির্যাসে যুক্ত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অমোঘ উচ্চারণ– 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।' এই উচ্চারণের সঙ্গে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় বাঙালিকে উজ্জীবিত করে বাঙালিত্বের গৌরবকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবার বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনাটির সৃষ্টি হয়। নির্মমভাবে নিহত হন বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এ হত্যাকাণ্ডের পরিচালনা করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের সাফল্যকে বিনষ্ট করে দেশকে উলটো ধারায় প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যেই ঘটানো হয় ইতিহাসের এ জঘন্য নারকীয় হত্যাকাণ্ড। ১৫ই আগস্টের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যে প্রশ্ন এসে যায় তাহলো– এটা কি কোনো ব্যক্তি হত্যা? কিছু উচ্চাভিলাষী সামরিক বাহিনীর সদস্যের ক্ষমতা দখলের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার জন্যই কি এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হয়েছিল? এর উত্তর একটিই। আর সেটা হলো– এটা কোনো ব্যক্তি হত্যা নয়, সম্পূর্ণভাবে একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য বঙ্গবন্ধু তিলে তিলে যে রাজনীতি গড়ে তুলেছিলেন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচন বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে রাজনীতি পরিণতি লাভ করেছিল এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যার বিজয় ঘটেছিল, সেই রাজনীতিকেই হত্যা করতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল। ওই রাজনীতি যাতে আর ঘুরে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য জেলের অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধকে নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতাকে। সুতরাং ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকে কোনোভাবেই ব্যক্তি হত্যা বলা যাবে না, এটা ছিল তাঁর রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতিকে হত্যার চেষ্টা।

১৯৭৫-এর আগস্ট-পরবর্তী দুই দশকে দেশে এমন একটি প্রজন্ম গড়ে ওঠে, যারা এদের পরিকল্পিত প্রচারণায় বিভ্রান্তির শিকার হয়। এ দীর্ঘ সময়ে এরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে তারা এতটা শক্তি সঞ্চয় করে যে দেশকে করে ফেলা হয় স্বাধীনতার চেতনা ও স্বাধীনতাবিরোধী ভাবধারায় দুই শিবিরে বিভক্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর পরই নয়া সামরিক শাসকচক্রের উদ্যোগে বাংলাদেশকে পাকিস্তানকরণের প্রক্রিয়া এইভাবে চলতে থাকে। এইভাবে সমকালীন ইতিহাস, সমকালীন রাজনীতির খপ্পরে পড়ে বিকৃত হয়ে বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়। ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক কার্যোদ্ধারই হয়ে ওঠে তাদের প্রধান প্রবণতা। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু যে এদেশের সমগ্র জনগণের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠেছিলেন, এ সত্যকে তারা আড়াল করেছে ইতিহাসের বিকৃত উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। এ ইতিহাস বিকৃতির বিষময় ফল হিসেবে একটি বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে মূল্যবোধহীনতা, সুবিধাবাদ, ন্যায়-নীতি বিবর্জিত উচ্চাভিলাষ, স্বার্থলোলুপতা ইত্যাদি প্রবল হয়ে উঠেছে; যা আমাদের সমগ্র দেশকে এক সর্বনাশা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্যই বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত অবদানকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন।

বাল্যকাল ও কৈশোর থেকে সংগ্রাম শুরু করা বঙ্গবন্ধু সারা জীবন একটি সাধানা করেছেন– আর তা হচ্ছে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। নিজের মধ্যে লুকায়িত রাজনীতির বীজ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে দ্রুত অঙ্কুরোদগম হয়। তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পাঠ করলেই বুঝতে পারি কী অসীম সাহসী, গভীর স্বদেশপ্রেমিক, সুনিশ্চিত লক্ষ্যভেদী এবং জনদরদি এক ভূমিপুত্রের জন্ম হয়েছিল এই অভাগা দেশে। বাঙালি জাতির গৌরব ও অহংকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এদেশের কিছু কুচক্রী মহল ও বিপথগামী সেনা কর্মকর্তাদের ষড়যন্ত্রে সমগ্র বাঙালি জাতিকে চোখের জলে ভাসিয়ে নির্মম শাহাদতবরণ করেন। তাই বাঙালি জাতির জীবনে আগস্ট শোকের মাস। এই মাসে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়কে কলুষিত করা হয়েছে। বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের শক্তিকে চিরতরে ধূলিসাৎ করার জঘন্যতম ঘটনাটি হচ্ছে সপরিবার বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় এটা প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাকে লালন করে জননেত্রী শেখ হাসিনা এদেশের মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কাজ করে চলেছেন অদ্যাবধি। আগস্ট মাসের শোককে শক্তিতে পরিণত করে আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থানে সৎ থেকে ও যথাযথ মেধার প্রয়োগ ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধু ও জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নে শরিক হবো– আজ এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন,

> বাকশাল পদ্ধতি একটি সাময়িক ব্যবস্থা। দেশকে পুরনো ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড় ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার পর আবার দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ফিরে যাব। সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যই বাকশাল পদ্ধতির নামে আমার এই দ্বিতীয় বিপ্লব। আমি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তবে তা হবে শোষিতের বিপ্লব।

কারাগারের রোজনামচা-তে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন বৈষম্যহীনতার চর্চার কথা।

> আমি যা খাই ওদের না দিয়ে খাই না। আমার বাড়িতেও একই নিয়ম।...আজ নতুন নতুন শিল্পপতিদের ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও দুই পাক হয়। সাহেবদের জন্য আলাদা, চাকরদের জন্য আলাদা। আমাদের দেশে যখন একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদ ছিল, তখন জমিদার, তালুকদারদের বাড়িতেও এই ব্যবস্থা ছিল না। আজ সামন্ততন্ত্রের কবরের ওপর শিল্প ও বাণিজ্য সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠতে শুরু করেছে, তখনই এই রকম মানসিক পরিবর্তনও শুরু হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের শোষণের চেয়েও এই শোষণ ভয়াবহ।

১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড বঙ্গবন্ধুকে এই স্বপ্নটি পূর্ণ করতে দেয়নি। তাঁর এই স্বপ্ন পূর্ণ হলে আজ বাংলাদেশকে অন্য চেহারায় দেখা যেত। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মানব ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে সপরিবার প্রাণ হারান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– যাঁর বিশাল অস্তিত্ব পড়ে আছে বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলজুড়ে, যাঁর জন্ম না হলে স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। এ কারণেই একথা বললে ভুল হবে না যে, বাংলাদেশের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আরও জোর দিয়ে বলা চলে– তিনিই বাংলাদেশ। পরিশেষে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাই–

> যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
> ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।
> দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা রক্তগঙ্গা বহমান
> তবু নাই ভয় হবে হবে জয় জয় মুজিবুর রহমান।

সহায়ক গ্রন্থ

১। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২।
২। শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৭।
৩। শরীফ উদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০২১।
৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ', *রবীন্দ্রনাথ-রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩।
৫। আতিউর রহমান, *বঙ্গবন্ধু: সহজপাঠ*, ঢাকা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, ২০১২।
৬। আতিউর রহমান, *বাংলাদেশের আরেক নাম শেখ মুজিব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০।
৭। আ. হাই ভূঁইয়া, *মুজিব মানেই বাংলাদেশ*, ঢাকা, রাজিব অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২০১০।
৮। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*: ২য় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২।
৯। বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র প্রকাশনা, *বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, আগস্ট, ২০১১।
১০। শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, *বিচিত্রা*, ১৬ই আগস্ট, ১৯৯৬।
১১। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০০০।
১২। রওনক জাহান, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, *প্রথম আলো*, ১৫ই জুলাই ২০১৯।
১৩। এম আনিসুজ্জামান, *স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯১।
১৪। মনি হায়দার, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা, কথাপ্রকাশ, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৭।
১৫। মওদুদ আহমেদ, *বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, ইউ পি এল, ২০০০।
১৬। ফয়েজ আহমেদ, *আগরতলা মামলা ও শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ*, ঢাকা, সাহিত্যপ্রকাশ, ২০০০।
১৭। সন্তোষ গুপ্ত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম* ১৯৬৯-৭১, সালাহউদ্দিন আহমেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস*, ১৯৪৭-৭১, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।
১৮। রাও ফরমান আলী খান, *বাংলাদেশের জন্ম*, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৬।
১৯। রফিক-উল-ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, ঢাকা, বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লি., ১৯৮১।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ১৭ই আগস্ট দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মূল ক্যাম্পাসের গোয়ানজন গ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করেছে। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম, সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারের মহাপরিচালক Kim Myung Hwan সহ দূতাবাস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগারটিতে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক বই, ২ দশমিক ৫ লক্ষাধিক জার্নাল ও ম্যাগাজিন রয়েছে এবং ৩৫ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। উক্ত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এ কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদকৃত বঙ্গবন্ধুর *ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ*, *বঙ্গবন্ধু দ্য পিপলস হিরো* ও বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* রয়েছে। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় লিখিত জাতির পিতার জীবন ও রাজনৈতিক দর্শন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্যসমৃদ্ধ প্রকাশনা রয়েছে– যা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রতিবেদন: প্রতাপ কুমার

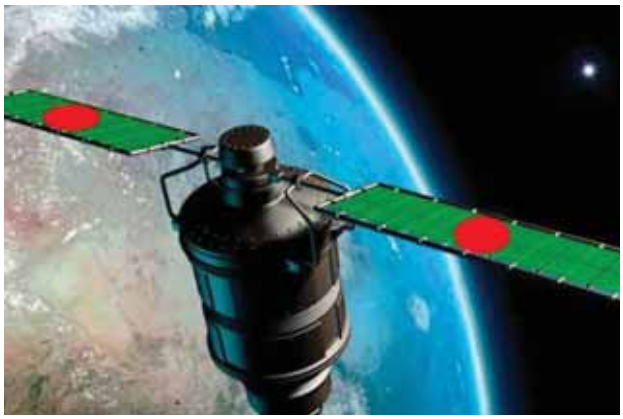

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আমাদের প্রাপ্তি

ড. আফরোজা পারভীন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর এটি। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, সম্ভ্রমহানি, আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম তার বয়স হচ্ছে অর্ধশতাব্দী। নবীন আর বলা যাবে না কিছুতেই।

বাঙালির গঞ্জনা-নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করার ইতিহাস পুরোনো। আমরা দুশো বছর ব্রিটিশের অধীনে ছিলাম। পাকিস্তানিদের অধীনে ছিলাম আমরা ২৪ বছর। হাজার মাইল দূরে বসে আমাদের টাকাপয়সা শুষে নিয়ে আমাদেরই ওপর তারা ছড়ি ঘুরাতো। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে বাংলার দামাল ছেলেরা। নয় মাসের যুদ্ধে ৩০ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা জীবন দিয়েছে। দুই লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের মালিক হতে। নিজ দেশে পরাধীন জীবন থেকে মুক্তি চেয়ে নিজেদের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, সুশাসনভিত্তিক সমাজ ও নিজ সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ। আজ সুবর্ণ জয়ন্তীর পাদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা। আমরা আজ স্বাধীন। ব্রিটিশরা নেই, পাকিস্তানিরা নেই, জমিদাররা নেই। আমরা পেয়েছি স্বজাতির শাসন। তাই আজ সময় এসেছে আমাদের চাওয়ার সাথে পাওয়ার হিসাব মিলিয়ে দেখার।

বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক। দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার, মাথাপিছু আয় সবক্ষেত্রেই সাফল্য এসেছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখ মেলে দেখার মতো। বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে সম্পদ উৎপাদন ও আহরণ।

১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকার বার্ষিক বাজেট আজ পরিণত হয়েছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেটে। ১২৯ ডলার মাথাপিছু আয়ের দেশটির বর্তমান মাথাপিছু আয় ২২২৭ ডলার।

একটি দেশের প্রকৃত সমৃদ্ধি বা অগ্রগতি নির্ভর করে কিছু নিয়ামকের ওপর। যার মধ্যে আছে জনগণের জীবনযাত্রার মানের বাস্তবরূপ, নিরাপদ খাদ্য, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মতপ্রকাশের অধিকার, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ।

উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শিক্ষা। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পাঁচ দশকে সব চাইতে বড়ো অর্জন জনগণের দীর্ঘদিনের চাহিদা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার বেড়েছে, সাক্ষরতার হার বেড়েছে, নারী শিক্ষার হার বেড়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছে, ঝরে পড়ার হার কমেছে, সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বেড়েছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ বেড়েছে প্রকৌশল, কৃষি, মেডিক্যাল, বস্ত্র, চামড়া ইত্যাদি শিক্ষার ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে বছরের শুরুতে। শিক্ষার মাধ্যমে নেতৃত্বদানের উপযোগী, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রগতিশীল, মানবমুখী, দূরদর্শী, অসাম্প্রদায়িক ও উদার-নৈতিক

সুনাগরিক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে চেষ্টা করছে সরকার। স্বাধীনতার সময় দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬.৮ শতাংশ, যা বর্তমানে ৭৪.৭ শতাংশে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার সুফল দ্রুত পৌঁছে দিতে সরকার শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন করছে, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। ছাত্ররা যাতে দেশপ্রেমমূলক বাঙালি জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন শিক্ষা পায় সেজন্য পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের সংগ্রামময় অতীতের কথা তুলে ধরা হচ্ছে। যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে ।

কর্মসংস্থান একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম ধারক ও বাহক। স্বাধীনতার ৫০ বছরে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বেসরকারি খাতে চাকরি বেড়েছে। সরকার বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করছে যাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই কাজ পায়।

একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি হলো দেশটির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিদেশি বিনিয়োগ ও বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। দেশের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরেই স্থিতিশীল। তাই বাংলাদেশের অগ্রগতি দৃষ্টিকাড়ে। ১৯৭১ সালে দেশটি ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত, সাহায্যনির্ভর, ঋণনির্ভর। সেই দেশটি আজ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশ। জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস কৃষিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি দেশটি। উৎপাদনের কৌশল বাড়িয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে সাফল্য দেখিয়েছে। সাফল্য দেখিয়েছে জনশক্তি রপ্তানিতে।

উন্নয়নের মহাসড়কে রয়েছে বাংলাদেশ। মহাসড়ক সংস্কার, মেট্রোরেল, টানেল, ওভার ব্রিজ, ফ্লাইওভার, অসংখ্য ব্রিজ-কালভার্ট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবন, রেল উন্নয়ন, নৌপথ উদ্ধার, নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। নারী উন্নয়ন নীতি, তথ্য অধিকার আইন, সড়ক নিরাপত্তা আইন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্য নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বয়স্ক নারী-পুরুষ, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য নেওয়া হয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্প ।

ডিজিটাল যুগে পদার্পণ করেছে বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশের মাধ্যমে দেশ এক নতুন জীবনধারার সাথে পরিচিত হয়েছে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেটা করেও দেখিয়েছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। যে-কোনো ধরনের বিল এখন অনলাইনে পরিশোধ করা যাচ্ছে। যে-কোনো অফিসের ফরম, কাগজপত্র অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া যাচ্ছে। কৃষক এখন ই-কৃষির সাথে পরিচিত। কৃষকের হাতে মোবাইল। ঘরে ঘরে কম্পিউটার। কেনাবেচা, লেনদেন হচ্ছে অনলাইনে। এই করোনাকালীন দুর্যোগে বোঝা যাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা কতটা কার্যকর। চালু হয়েছে ই-পাসপোর্ট। বাংলাদেশকে ডিজিটাল করার জন্য কম্পিউটার, ল্যাপটপসহ আধুনিক সব যন্ত্রপাতির ওপর থেকে ট্যাক্স প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার ইউনিয়নে সাবমেরিন ক্যাবল পৌঁছে গেছে। আমরা স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণ করেছি। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। দেশের সবকটি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১৭ কোটি ছাড়িয়েছে। ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১১ কোটি ১৯ লক্ষ, যা প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু করা হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু রয়েছে। এসব তথ্য কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সরকারি ফরম, নোটিশ, পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত তথ্য, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সেবা বিষয়ক তথ্য, চাকরির খবর, নাগরিকত্ব সনদপত্র, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিদেশে চাকরি প্রাপ্তির লক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশনসহ ২২০টি সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু জীবন বিমা, মাটি পরীক্ষা ও সারের সুপারিশ, জমির পর্চাসহ অন্যান্য সেবা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রায় ১০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে মোবাইল স্বাস্থ্য সেবা টেলিমেডিসিন সিস্টেম চলছে। থ্রি-জি'র পর ফোর-জি (২০১৮) প্রযুক্তি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ব্যাপকভাবে। মোবাইল ফোনেই ভিডিও কল করা যাচ্ছে এখন, টিভি দেখা হচ্ছে, ইন্টারনেটের গতি বেড়েছে। করোনা মহামারিতে অনলাইন ক্লাসে টেলিকনফারেন্স এখন সহজ ব্যাপার।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে আমরা পেয়েছি একটি আনন্দ সংবাদ। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ জাতিসংঘ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ । ওই দিন স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি'র (সিডিপি) চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ। এর ফলে ২০২৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ঘোষিত হবে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের তিনটি শর্ত ছিল– মাথাপিছু আয় কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলারে রাখা, মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ পয়েন্ট ও অর্থনীতির ভঙ্গুরতা সূচকে ৩২ বা নিচে আনা। ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ তিনটি শর্তই পূরণ করে এসেছে।

২০২০ সালের অক্টোবর মাসে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে। ভিকটিমের দ্রুত বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলার রায় ঘোষিত হয়েছে (১০ই অক্টোবর ২০১৮), এর আগে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, জেল হত্যাকাণ্ড ও বিডিআর

সদস্য কর্তৃক সেনাসদস্যদের হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচার কার্যক্রম এখনো চলমান। সবচেয়ে বড়ো কথা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার বিচারও সম্পন্ন করতে পেরেছে বর্তমান সরকার। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক আহমদ ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। উদ্দেশ্য ছিল বিচারের হাত থেকে খুনিদের রক্ষা করা। জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্সকে আইন হিসেবে অনুমোদন করেন। খুনিদের রক্ষা করার জন্য এই জাতীয় আইন তখনই প্রণীত হয় যখন প্রণেতারা নিজেরাই খুনের সাথে জড়িত থাকেন।

১৯৯৬ সালের ১৪ই নভেম্বর পার্লামেন্টে ইনডেমনিটি আইন বাতিল করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি সিআইডি এই মামলায় ২০ জনকে অভিযুক্ত করে মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। ২০১০ সালের ২৭শে জানুয়ারি আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে আসামিদের রিভিউ খারিজ হয়। পাঁচ জন আসামির ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়। সাত আসামি পলাতক ছিলেন। এদের মধ্যে ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ ২০২০ সালে কলকাতা থেকে ধরা পড়েন এবং তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বিশ্বের ১৬৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ঝুঁকির মধ্যে থেকেও এগিয়ে চলেছে। শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ভাষণে বদ্বীপ পরিকল্পনা–২১০০ শীর্ষক মেগাপ্রকল্পের কথা বলেছিলেন, যা আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সক্ষমতা সৃষ্টিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে একীভূত করার দৃষ্টান্ত।

২০১৭ সালে বাংলাদেশের ১০ লাখেরও বেশি শ্রমিক গেছেন বিভিন্ন দেশে। রেমিটেন্স গতি ফিরে পেয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স এসেছিল ১১৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার। অন্যদিকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুন মাস পর্যন্ত এক হাজার ৮০০ কোটি (১৮ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স এসেছে। বিশ্বজুড়ে মহামারি চলার মধ্যেও রেমিটেন্স বাড়ায় বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ আরও বেড়েছে। ২০২০ সালের জুন মাসে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৫ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে দেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে এর শাখা স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যাংকের মাধ্যমে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অভিবাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা দেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু জনগণকে রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকেও এ সেবা গ্রহণের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ছাড়াই স্বল্প ব্যয়ে মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলোতে শ্রমিকরা যেতে পেরেছে।

বাংলাদেশের প্রথম নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে সনদ পেয়েছে জামদানি ও ইলিশ মাছ। ফলে এ দুটি পণ্যের স্বত্ব কেবলই বাংলাদেশের। বাংলাদেশে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা বিরাজ করছে। সরকারের পক্ষ থেকে সকল সহায়তা প্রসারিত করা হয়েছে। বিনিয়োগের জন্য ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নে অনেক দূর এগিয়েছে দেশ। পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। আর এই শিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছে নারী। ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৮০%-এর উপর নারী। বাংলাদেশ সরকার নানাভাবে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে।

কৃষি খাতে অভূতপূর্ব কিছু সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। প্রায় ১৭ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম আবিষ্কার করেছেন পাটের জিনোম সিকুয়েন্সিং। সারা বিশ্বে আজ পর্যন্ত মাত্র ১৭টি উদ্ভিদের জিনোম সিকুয়েন্সিং হয়েছে, তার মধ্যে ড. মাকসুদুল করেছেন তিনটা। তাঁর এই অনন্য অর্জন বাংলাদেশের মানুষকে করেছে গর্বিত।

পোশাক শিল্পের পাশাপাশি প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ওষুধ, ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে জাহাজ, ওষুধ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী। বাংলাদেশের আইটি শিল্প বহির্বিশ্বে অভূতপূর্ব সুনাম কুড়িয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের আইটি শিল্পে ১০ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় ছাড়িয়ে গেছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে মোট ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত হয়েছে 'কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন ২০১২'-এর খসড়া।

বিগত চার দশক ধরে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে আসছে। রোহিঙ্গারা পাশের দেশ মিয়ানমার থেকে রাষ্ট্র ও উগ্র বৌদ্ধদের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমারের নেই কোনো আগ্রহ। মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোই বাংলাদেশের লক্ষ্য। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। ফলে বাংলাদেশকে কিছু ব্যবস্থাপনাগত উদ্যোগ নিতে হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের একটি অংশকে ইতোমধ্যে ভাসানচরে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কাজটি সফলভাবে করা গেছে।

শেখ হাসিনা সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা নদীর পানি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ, ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সামুদ্রিক জলসীমা বিরোধের নিষ্পত্তি, কৃষকদের জন্য কৃষিকার্ড এবং ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা, বিনা জামানতে বর্গাচাষিদের ঋণ প্রদান, চিকিৎসা সেবার জন্য সারা দেশে প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের ৩৮.৪ থেকে ২০১৩-২০১৪ বছরে ২৪.৩ শতাংশে হ্রাস, জাতিসংঘ কর্তৃক শেখ হাসিনার শান্তির মেডেল গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়াও ভারতের পার্লামেন্ট কর্তৃক স্থল সীমানা চুক্তির অনুমোদন এবং দুই দেশ কর্তৃক অনুসমর্থন। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে ৬৮ বছরের সীমানা বিরোধের অবসান হয়েছে।

দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একুশটি জেলার জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও দাবি ছিল পদ্মা সেতু। শেখ হাসিনা পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণের স্বপ্নই দেখেননি তার বাস্তব রূপায়ণও দেখতে চেয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে তিনি পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেন। সেতু নির্মাণের এক পর্যায়ে ঋণচুক্তি স্থগিত করে বিশ্বব্যাংক। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ৮ই জুলাই ২০১২ সালে জাতীয় সংসদের অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন, 'পদ্মা সেতু অবশ্যই হবে। তবে তা নিজস্ব অর্থায়নেই। অন্যের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা এনে পদ্মা সেতু করব না। আমাদের জনগণের টাকায়ই পদ্মা সেতু নির্মিত হবে।' পদ্মা সেতু নির্মিত হচ্ছে। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর সবচেয়ে বৃহৎ সেতু। পদ্মা সেতুতে সড়ক ও রেলপথ ছাড়াও আরও আছে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অপটিক্যাল ফাইবার লাইন পরিবহণ সুবিধা।

পদ্মা সেতু শুধুমাত্র যোগাযোগ নেটওয়ার্ক-এ বিপ্লব ঘটাবে না। এ সেতু সতেরো কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর ইতিবাচক প্রভাবও ফেলবে।

শেখ হাসিনার আমলের আর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য সমুদ্র জয়। প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে ১৯৭৪ সাল থেকে সমুদ্রসীমা নিয়ে কয়েক দশকের বিরোধ সফলভাবে মোকাবিলা করেছে সরকার। ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল অন ল'স অব দ্য সি'স (ইটলস) এবং দ্য হেগের আন্তর্জাতিক আদালত থেকে ২০১২ ও ২০১৩ সালে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে বাংলাদেশ। সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রসীমার ওপর নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশের প্রথম মেট্রোরেল চালু করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে কাজ। এমআরটি-৬ নামের এ প্রকল্পের উত্তরা থেকে আগারগাঁও ১১ দশমিক ২৯ কিলোমিটার অংশ পর্যন্ত ২০২১ এবং আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার ২০২৩ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৪৫৩ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। আরও ৬৬১ কিলোমিটার মহাসড়ক চার এবং তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। ঢাকায় বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ ২০২৩ সাল নাগাদ শেষ হবে।

'ওয়ান সিটি–টু টাউন' মডেলে চট্টগ্রাম শহরের সাথে আনোয়ারাকে যুক্ত করতে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে তৈরি হচ্ছে সাড়ে তিন কিলোমিটারের সুড়ঙ্গপথ। চীনা অর্থায়নে চলমান বঙ্গবন্ধু টানেল প্রকল্পে কাজ করছে চায়না কমিউনিকেশন্স কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (সিসিসিসি)।

এসব সাফল্যের বাইরে আরও অনেক বড়ো একটি সাফল্য জাতির পিতার লিখিত অসামান্য পুস্তকগুলো আবিষ্কার, তার পাঠোদ্ধার ও প্রকাশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক, সংগ্রামী, দেশপ্রেমিক সত্তার কথা আমরা জানি। কিন্তু তিনি যে একজন অনন্য লেখক সে পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। সে পরিচয় আমরা জানলাম তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* প্রকাশের পর। একে একে প্রকাশ হলো *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয়াচীন*। আমরা পেলাম জীবন ঘেঁষা সংবেদী মাটিলগ্ন এক লেখককে।

এ বছরের ১৭ই মার্চ ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৭ই মার্চ ১৯২০–১৫ই আগস্ট ১৯৭৫) জন্মশতবর্ষ। জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ বেশ কজন বিশ্বনেতা এসেছিলেন বাংলাদেশে।

শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বিশ্বের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠান শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন ডিগ্রি এবং পুরস্কার প্রদান করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সুদীর্ঘ ২৫ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে ইউনেসকো তাঁকে 'হুপে-বোয়ানি' (Houphouet-Boigny) শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। ২০০৯ সালে ভারতের ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অসামান্য ভূমিকা পালনের জন্য তাঁকে 'ইন্দিরা গান্ধী' পুরস্কারে ভূষিত করে। এছাড়া তিনি ব্রিটেনের গ্লোবাল ডাইভার্সিটি পুরস্কার এবং দুবার সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১৪ সালে ইউনেসকো তাঁকে 'শান্তির বৃক্ষ' পুরস্কারে ভূষিত করে। ২০১৫ সালে উইমেন ইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাঁকে রিজিওনাল লিডারশিপ পুরস্কার এবং গ্লোবাল সাউথ-সাউথ ডেভেলপমেন্ট এক্সপো ২০১৪ ভিশনারি পুরস্কারে ভূষিত করে। বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে অব্যাহত সমর্থন, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদানের জন্য আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে তাঁকে সম্মাননা সনদ প্রদান করে। জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে শেখ হাসিনাকে তাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ ২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করে। এছাড়া টেকসই ডিজিটাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য International Telecommunication Union (ITU) শেখ হাসিনাকে ICTs in Sustainable Development Award 2015 প্রদান করে। রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবিলা করে শেখ হাসিনা পেয়েছেন মাদার অব হিউম্যানিটি খেতাব।

জনগণের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য অবিচল থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। এই যাত্রায় বার বার জীবনের ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছেন শেখ হাসিনা। মুখোমুখি হয়েছেন কঠিন চ্যালেঞ্জের। কিন্তু তিনি থামেননি।

বৎসরাধিককাল ধরে বিশ্বব্যাপী মহামারির তোপে আমরা আক্রান্ত। থমকে গিয়েছে সারা বিশ্ব। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়েছে, হচ্ছে। তারপরও এ কঠিন দুর্যোগ সরকার ভালোভাবে মোকাবিলা করেছে। দেশে ভ্যাকসিন এসেছে। জনগণ টিকা গ্রহণ করছে।

পৃথিবী আবার স্বাভাবিক হবে, বাংলাদেশ ফিরবে সুস্থ উন্নয়নের গতিধারায়– এ প্রত্যাশা রইল।

লেখক: কথাশিল্পী, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক, কলামিস্ট ও অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব

শুদ্ধাচারের চর্চা করি
সমৃদ্ধ দেশ গড়ি

জীবিতের চেয়েও অধিক জীবিত তুমি

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

> আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন; ... আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ... বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই।...
>
> ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।
>
> (১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদত্ত ভাষণ)

১৯২১ সালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' নির্মাণের প্রাক্কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কটল্যান্ডের নগর পরিকল্পনাবিদ ও নকশাবিদ স্যার প্যাট্রিক গিডেসকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে একটি জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, আমি সেই মানুষ খুঁজছি যাঁর মধ্যে থাকবে যথার্থ চিন্তা, যাঁর অনুভব হবে মহান এবং যাঁর আছে সঠিক সময়ে সঠিক কর্ম করার কৌশল জ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত এই তিন বৈশিষ্ট্যই যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলি। তিনি হয়ত এখানে নেতৃত্ব সম্পর্কে সরাসরি কিছু লিখতে চাননি, কিন্তু তিনি না চাইলেও পরবর্তীকালে তাত্ত্বিকেরা নেতৃত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে এই তিন বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন।

এই তিন গুণে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রনায়কগণ ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন কালে কালে। তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, আত্মত্যাগ আর আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁদেরকে নিয়ে গেছে চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে। এই নেতারাই আবার কলম ধরেছেন তাঁদের মননের সাথে আমাদের পরিচয় করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। স্যার উইনস্টন চার্চিল তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *The Second World War* প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'It is not history, It is a contribution to the history'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সৃষ্টি করে যেমন ইতিহাস গড়েছেন, তেমনি তাঁর জীবনী লিখে ইতিহাসকে বাড়তি কিছু দিয়ে গেছেন– একথা অনস্বীকার্য।

যুগে যুগে কিছু মানুষ আসেন যাঁদের নেতৃত্ব-দর্শন পালটে দেয় পৃথিবীকে, দেশকে, এমনকি দেশের মানুষকেও। তাঁদের আলোতে আলোকিত হয় মানুষ ও দেশ। শ্লাঘার সাথে বাংলার জনগণ বলতে পারে, আমাদের একজন আছেন এমন, তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর আয়ু ছিল মাত্র ৫৫ বছর ৪ মাস ২৯ দিন। কারাগারেই ছিলেন ৪ হাজার ৬৮২ দিন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন কারাগারে। বন্দি জীবনের সময়টা তিনি অপচয় করেননি। লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর মানস নির্মিতির ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, ভাবনা, আদর্শ, বাঙালির অধিকার আদায়ে সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতির কথা। সেসব পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ৩৪৫ পৃষ্ঠার *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২) ও ৩০২ পৃষ্ঠার *কারাগারের রোজনামচা* (২০১৭) এবং চীন সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০ পৃষ্ঠার *আমার দেখা নয়াচীন* (২০২০)।

তাঁর বিস্তৃত লেখার কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরে মানবিক মুজিব ও তাঁর ভেতরের আগুনের সন্ধান করার ক্ষুদ্র চেষ্টা থেকেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। জাতির পিতার তিনটি বই থেকে দুটি বই (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা*) নিয়ে প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে টুকরো টুকরো কিছু আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আমাদের উপমহাদেশের অনেক রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কও আত্মজীবনী লিখেছেন। মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন *The Story of My Experiments with Truth*; জওহরলাল নেহেরু লিখেছেন *An Autobiography*; সম্রাট বাবরও লিখেছিলেন *বাবরনামা*। নেলসন মেন্ডেলা লিখেছেন *Long Walk to Freedom*। এরকম নজির যে ভূরি ভূরি, তা কিন্তু নয়। এই বিরল দৃষ্টান্তের মধ্যেও বিরল আমাদের জাতির পিতার তিনটি বই।

১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অন্তরীণ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। জেল-জুলুম, নিগ্রহ-নিপীড়ন যাঁকে সারা জীবন তাড়া করে ফিরেছে, মানুষের অধিকার আদায়ে যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, এত কিছুর মধ্যেও আত্মজীবনী লেখায় হাত দিয়েছিলেন এবং কিছুটা হলেও সেই সময়ের চিত্র লেখনীর মাধ্যমে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন।

২

১৯৪৭-এ উপমহাদেশ ভাগের পরই বাংলাদেশ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সেই সময় বেকার হোস্টেলে বসে তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন, 'মাওড়াদের সাথে থাকা যাবে না।' তিনি শেখ মুজিব!

১৯৬৬ সালে ছয় দফা পেশ করার পর শেখ মুজিব লন্ডন সফরে গেলে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক (তখন বিবিসি'তে কর্মরত) বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চাইলেন, 'ছয় দফা' বিষয়টি কী? শেখ মুজিব তখনো 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাননি। সৈয়দ হকের দিকে তিনটি আঙুল দেখিয়ে স্পষ্ট করে বললেন, 'কত নিছ? কবে দিবা? কবে যাবা?'

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মোড় ঘুরানো এই 'ছয় দফা' আন্দোলনে বাঙালির ওপর নেমে আসা নির্যাতনে ভিন্ন এক মুজিব বের হয়ে আসে তাঁর শৌর্যের খোলস ভেদ করে। তিনি বিচলিত হয়ে লিখলেন *কারাগারের রোজনামচা*'য় ১৯৬৬-এর ৬ই জুন, 'এ ত্যাগ বৃথা যাবে না, যায় নাই কোনোদিন। নিজে ভোগ করতে নাও পারি, দেখে যেতে নাও পারি। তবে ভবিষ্যৎ বংশধররা আজাদী ভোগ করবে।'

প্রাণাধিক প্রিয় বাঙালিদের জন্য আবেগমথিত হৃদয়ে আবার জেগে উঠল আমাদের চিরচেনা দৃঢ় প্রত্যয়ী সেই মুজিব। ৮ই জুন লিখলেন, 'যে রক্ত আজ আমার দেশের ভাইদের বুক থেকে বেরিয়ে ঢাকার পিচঢালা কাল রাস্তা লাল করেছে, সে রক্ত বৃথা যেতে পারে না।' (*কারাগারের রোজনামচা*)। এই হচ্ছে শেখ মুজিব। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এখানে মহাত্মা গান্ধীর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। *The Story of My Experiments with Truth*-এ গান্ধীও এমন বিশ্বাসই ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'যখন হতাশা কাজ করত, আমি স্মরণ করতাম যে ইতিহাসে সবসময় সত্য ও ভালোবাসার জয় হয়েছে। অত্যাচারী ও খুনিরা সাময়িকভাবে অপরাজেয় মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের পতন অনিবার্য'।

বঙ্গবন্ধুর লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে কত রঙের, কত রূপের, কত প্রকরণের এক মানুষকে যে পাওয়া যায়! বইটি যিনিই পড়েছেন তিনিই সম্যক জানতে পেরেছেন মুজিব মানসের নানান ধরনের অভিব্যক্তি, ভাবনা এবং নিজ মাটির প্রতি অন্তর্গত দৃঢ় অঙ্গীকার সম্পর্কে। সেই বয়ানে পাওয়া যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ়চেতা এবং মানবিক শেখ মুজিবকেও।

বঙ্গবন্ধুর বইগুলো মূলত সেই সময়ের শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দর্শন ও নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে ধারণা দেয়। তাঁর দর্শন ও কৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্পষ্ট করেই স্বীকার করেছেন, 'যদি কোনো ভুল হয় বা অন্যায় করে ফেলি, তা স্বীকার করতে আমার কোনোদিন কষ্ট হয় নাই। ভুল হলে সংশোধন করে নেব, ভুল তো মানুষেরই হয়ে থাকে। আমি অনেকের মধ্যে দেখেছি, কোনো কাজ করতে গেলে শুধু চিন্তাই করে। চিন্তা করতে করতে সময় পার হয়ে যায়, কাজ আর হয়ে ওঠে না। ... আমি চিন্তাভাবনা করে যে কাজটা করব ঠিক করি, তা করেই ফেলি। যদি ভুল হয় সংশোধন করে নেই।'

এ যেন সেই গান্ধীজির কথাই। *The Story of My Experiments with Truth* গ্রন্থে এমনটিই যেন লিখেছেন, 'যদি আমার লেখার মধ্যে পাঠকের কাছে আমার অহংকারের সপ্তম সুরের আভাস পায়, তবে তারা অবশ্য জানবেন যে আমার সাধনার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে।' সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা তো এমনই।

৩

আমাদের জাতির পিতা ছোটোবেলায় ছিলেন দুরন্ত এক কিশোর। অবাক করা বিষয় হলো, তাঁর ভেতরেও সেই সময় কিশোর সুলভ ভীতি কাজ করত। দুরন্তপনার পাশাপাশি তাঁর এই ভীতি প্রসঙ্গেও তিনি অবলীলায় আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৬-এ তাঁর চোখে গ্লুকোমা ধরা পরার পর ডাক্তার তাঁকে অপারেশন করতে বললে ভয় পেয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবন বিভিন্ন ব্যাধির কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। সেই ঘটনাবহুল শিক্ষাজীবনের কথাও তিনি *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে বলে গেছেন সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে।

বঙ্গবন্ধুর মানস নির্মিতি ও রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা পাওয়া যায় তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা*'য়।

বঙ্গবন্ধু তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনীতির শীর্ষে উঠে আসেন। এটি কিছুতেই সহজসাধ্য ছিল না। এজন্য তাঁকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত তাঁর রাজনীতির গুরু গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনীতির পরিশীলিত নিয়মতান্ত্রিক ধারা; আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায়ের অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক রাজনীতি; নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনীতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ; নজরুল ও হুমায়ুন কবিরের সান্নিধ্যের প্রভাবে রাজনীতি ও সংস্কৃতির চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীন রাজনীতির গতিপথ বিনির্মাণে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু সেই সময়ের ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তুলে ধরার পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্য, নির্যাতন এবং অধিকার ও সম্পদ লুট করার জ্বলজ্বলে চিত্র তুলে ধরেছেন।

সোহরাওয়ার্দীর সাথে পরিচয় এবং পরবর্তীতে একসাথে দীর্ঘদিনের পথচলার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'তে ৪৭ থেকে ৪৯ পৃষ্ঠায় এক পর্যায়ে লিখলেন, 'বাঙালিরা শহীদ সাহেবকে প্রথম চিনতে পারে নাই। যখন চিনতে পারল, তখন আর সময় ছিল না'।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন, আদমজীর দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন ও ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ এবং এসব বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সমৃদ্ধ হয়েছে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। সঙ্গে রয়েছে তাঁর বংশপরিচয়, শৈশবকাল এবং শিক্ষাজীবনের নির্মোহ বর্ণনা।

৪

শেখ মুজিব রাজনীতিবিদ। ইতিহাসের এক কঠিনতম সময়ে তাঁর রাজনৈতিক পদচারণ। সেই আগুনঝরা সময়ে ব্যক্তি মুজিবকে কতটা অসহনীয় দিন পার করতে হয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায় তাঁরই বয়ানে।

> একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম, হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে, একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, 'হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি'। আমি আর রেণু দুজনেই শুনলাম, আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, 'আমি তো তোমারও আব্বা'। কামাল আমার কাছে আসতে চাইতো না, আজ গলা ধরে পড়ে রইলো, বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন

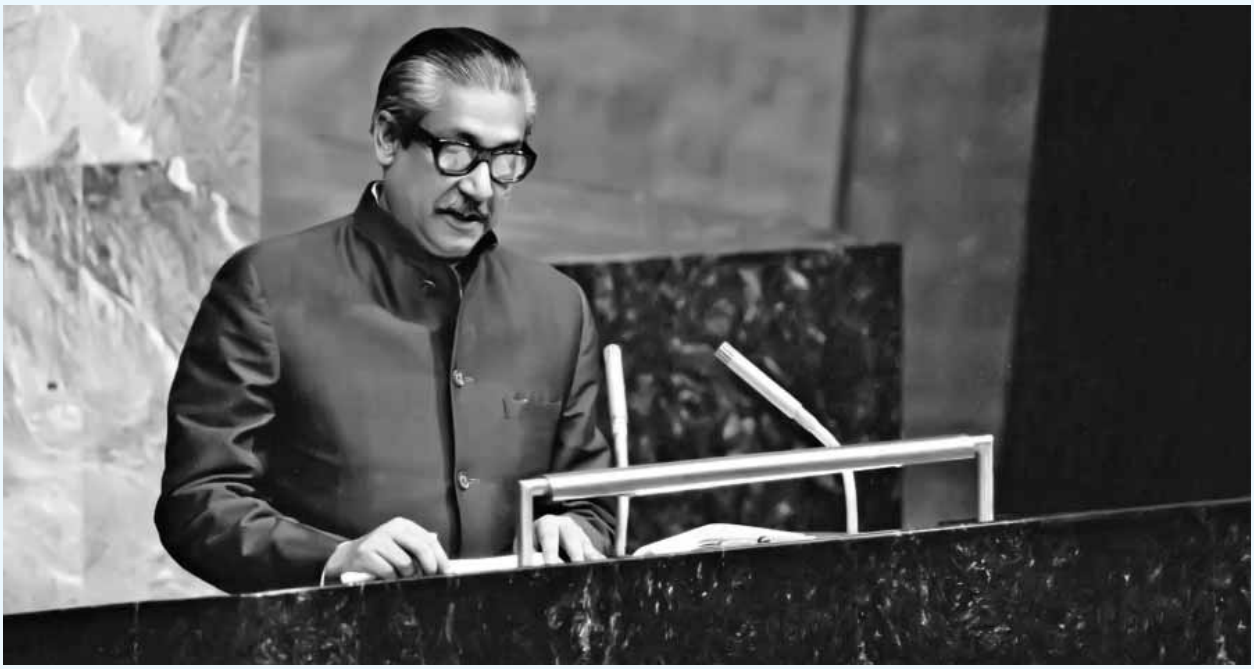

জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

> ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে রাখা যে কতো বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২০৯)

'মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়'– এ উপলব্ধিই বুঝিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগের মূল দর্শনের সুতো কোথায় বাঁধা। রাজনৈতিক আদর্শকে সমুন্নত রাখতে, মানুষের অধিকার আদায়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের সুখ ও আনন্দ বিসর্জন দেওয়ার উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে। 'ছেলেমেয়েদের জন্য যেন একটু বেশি মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, তবুও যেতে হবে। দেশ সেবায় নেমেছি, দয়া মায়া করে লাভ কি? দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে এবং সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে।' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৬৪) স্বদেশ ও তার জনগণের আত্মমর্যাদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য জাতির পিতার আত্মত্যাগের সুপ্ত প্রত্যয় এভাবেই ফুটে উঠেছে বইটির নানান ছত্রে।

৫

বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সচেতনতা এবং এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা ছিল খুবই তীক্ষ্ণ ও সুগভীর। বিভিন্ন সময়ে তাঁর ভাষণেও এর প্রকাশ দেখা যায়।

ছাত্রাবস্থায় মাদারীপুরে স্বদেশ আন্দোলনকারী ও তাঁদের নেতা অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র দাশের মুক্তিতে কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতা ও তাতে 'জয় বাংলা'র উল্লেখ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পার্টির সাথে যোগাযোগের কারণে তাঁর মনোজগতে প্রগতিশীলতা ও অসাম্প্রদায়িকতার বীজমন্ত্র রোপিত হতে থাকে। পাশাপাশি নিয়মিত দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা, কবি নজরুল ও কবি হুমায়ুন কবিরের সাথে সখ্যতা তাঁর শুদ্ধ সংস্কৃতি মনস্কতা সৃষ্টিতে জোরালো ভূমিকা রাখে। তিনি হতে থাকেন পুরোপুরি এক বিশুদ্ধ বাঙালি।

বাংলার নদী, বাংলার জল, খাবার, বাংলার গান, বাংলার উর্বর জমি আর নৈসর্গিক সৌন্দর্য তাঁকে সবসময় বিমোহিত করত। একবার এক অনুষ্ঠান শেষে নদীপথে নৌকা দিয়ে ঢাকার উদ্দেশে আসছিলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকসংগীত শিল্পী আব্বাসউদ্দিন ছিলেন সহযাত্রী। পথে আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শুনে তিনি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি লিখেন, 'নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে।'

বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার গান সর্বোপরি বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর উপলব্ধি, প্রত্যয় এবং নিজেকে নিবেদিত করার প্রসঙ্গে আত্মজীবনীর বেশ কিছু জায়গায় বার বার বলেছেন বঙ্গবন্ধু। একবার বাংলার লোকসংগীতের জাদুকর শিল্পী আব্বাসউদ্দিন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'র ১১০ থেকে ১১১ পৃষ্ঠায় লিখলেন। এক পর্যায়ে লিখলেন, ... "তিনি (আব্বাসউদ্দিন) আমাকে বলেছিলেন, 'মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে'। আমি কথা দিয়েছিলাম এবং কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলাম।"

১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও অগণিত মানুষের মৃত্যু বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন, 'যুদ্ধ করে ইংরেজ, আর না খেয়ে মরে বাঙালি; যে বাঙালির কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত।' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১৮)

বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর ভেতরে কীভাবে হাজারো বারুদের জন্ম নিচ্ছে ধীরে ধীরে, তা এসব লেখনীর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে।

৬

অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ও নেতৃত্বের কারণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভক্ত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশবিরোধী ত্যাগী ও কারানির্যাতন ভোগকারী সংগ্রামীদের প্রসঙ্গ টেনে লিখেন : 'জীবনভর কারাজীবন ভোগ করেছে ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। এই সময় যদি এই সকল নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ত্যাগী পুরুষরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার ও জুলুম হিন্দু জমিদার ও বেনিয়ারা করেছিল, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, তাহলে তিক্ততা এত বাড়ত না।'

আওয়ামী মুসলিম লীগের নামকরণের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে ব্যক্ত করেন, 'আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু মেনিফেস্টো থাকবে'। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১২১)।

সকল ধর্মের সহাবস্থান ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি যেমন তাঁর জীবনী ও রোজনামচা লিখতে গিয়ে বার বার দুস্থ ও গরিবের প্রসঙ্গ এনেছেন, তেমনি তাঁর বিভিন্ন ভাষণেও দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁর অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারি টাঙ্গাইলে তিনি এক জনসভায় বলেছিলেন, "বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা হবে। শোষকদের আর বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না। ... গরিব হবে এই রাষ্ট্র এবং এই সম্পদের মালিক, শোষকরা হবে না। এই রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ থাকবে না। এই রাষ্ট্রের মানুষ হবে বাঙালি। তাদের মূলমন্ত্র– 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে কিন্তু এর অর্থ বিশৃঙ্খলা নয়।"

বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নীতি ও আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ছাড়া বাঙালির জাতীয় মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। ১৯৬০-এর দশকে বাঙালির মুক্তিসনদ বা ম্যাগনাকার্টা ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে অবিশ্বাস্য গতিতে আওয়ামী লীগকে বাঙালির জাতীয় মুক্তির মঞ্চে পরিণত করতে সক্ষম হন, যে দলের নেতৃত্বে পরবর্তীকালে আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করি।

৭

কারাগারের রোজনামচা'তে কারাগারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন খুঁটিনাটি বর্ণনা ছাড়াও সমসাময়িক রাজনীতির নানান বিষয়ও উঠে এসেছে। দেশ ও মানুষের জন্য অকৃত্রিম ভাবনা ও রাজনৈতিক দর্শন যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি বাবা বা স্বামীর আকুতি ও কান্নার রং চিত্রায়ণ করেছেন জাতির পিতা। যখন এটি তিনি লিখেন তখন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ আগ্নেয়গিরির মতো ফুটছে। ছয় দফা কর্মসূচির মধ্যে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে পুনর্বার গ্রেপ্তারের পর কারাগারে বসেই লিখলেন বইটি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা *কারাগারের রোজনামচা*'য় ভূমিকা লিখতে গিয়ে লিখেছেন, 'বাংলার মানুষ যে স্বাধীন হবে, এ আত্মবিশ্বাস বার বার তাঁর (বঙ্গবন্ধু) লেখায় ফুটে উঠেছে। এত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পৃথিবীর আর কোনো নেতা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন কি না জানি না'।

কারাগারের রোজনামচা'য় ৭ই জুন ১৯৬৬ বঙ্গবন্ধু লিখলেন, '... জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয় দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। ... এ খবর শুনলেও আমার মনকে বুঝাতে পারছি না। একবার বাইরে একবার ভিতরে, খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। বন্দি আমি, জনগণের মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কি করতে পারি।'

তাঁর হাত দিয়ে বাঙালি যেমন নিজের রাষ্ট্র পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার আদর্শ। এই তিনিই তো ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই'। সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, অসীম আত্মবিশ্বাস, গভীর দেশপ্রেম ও ত্যাগের মানসিকতার পাশাপাশি মানুষের ভালোবাসা বঙ্গবন্ধুকে স্বীয় স্থানে পৌঁছে দেয়।

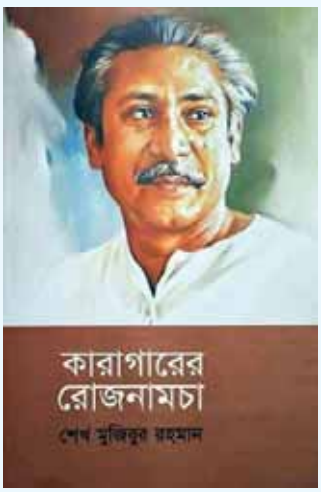

ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *The Wings of Fire*-এ লিখেছেন, 'আমরা সবাই আমাদের ভেতরে এক স্বর্গীয় আগুন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের উচিত এই আগুনে ডানাজুড়ে দিয়ে সেই আলোর মহিমায় পৃথিবীকে মহিমান্বিত করে দেওয়া।'

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এক ছোটো আগুনের ফুলকি নিয়ে জন্ম নেওয়া শেখ মুজিবুর রহমান খোকা তাঁর অন্তর্গত ফুলকিকে প্রজ্বলিত মশালে রূপ দিয়ে শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো বিশ্বকে আলোকিত করেছিলেন। এই ধ্রুব সত্য তাঁর শত্রুরাও অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য।

তাই বঙ্গবন্ধুর কর্ম, আদর্শ আর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আজও সেই প্রজ্বলিত মশালের মতোই বাঙালিদের পথ দেখায়। এখানেই বঙ্গবন্ধু যেন জীবিতের চেয়েও অধিক জীবিত।

কবি শামসুর রাহমানের মতো বলতে হয়,

> আমরা নিজেদের ধ্বংসস্তূপে ব'সে বিলাপে ক্রন্দনে আকাশকে ব্যথিত করে তুলেছিলাম ক্রমাগত; তুমি সেই বিলাপকে রূপান্তরিত করেছো জীবনের স্তুতি গানে, কেননা জেনেছি জীবিতের চেয়েও অধিক জীবিত তুমি। (ধন্য সেই পুরুষ)

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

শামীমা চৌধুরী

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার যে পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয় তা হঠাৎ করে আসেনি। বাঙালি জাতির জন্ম ও গড়ে ওঠা কয়েকশো বছর আগে। অভিন্ন ভাষা, আর্থসামাজিক জীবনধারা, শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক গড়নের অভিন্নতা নিয়েই এই জাতি ধীরে ধীরে একটি উন্নত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র বিধৌত পলিমাটির দেশের এই জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন এই অঞ্চলের প্রায় দক্ষিণ ঘেঁষা সবুজ, শান্ত গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেওয়া 'মুজিব' নামের এক মহিরুহ।

বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন প্রাধান্য পায় তাঁর সংগ্রামী জীবন, জেল জীবন, রাজনৈতিক জীবন। তাঁর সাংবাদিক জীবন ও এ পেশার ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আলোচিত কম হয়। যা এই লেখায় তুলে ধরা হলো।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের পেশাগত উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু

১৯৭২ সালে স্বাধীনতা লাভের পরপরই সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশাসন, আইন, বিচার ব্যবস্থা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ এই পেশার সাথে সংশ্লিষ্টদের জীবনের মানোন্নয়নের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের অনেক আগেই স্বাধীন বাংলাকে সহস্রাব্দের উন্নয়নের শিখড়ে পৌঁছানোর স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। তাই স্বাধীনতা লাভের পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে প্রণীত আমাদের সংবিধানের পাতায় এর বাস্তবতা রয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি এসেছে সাংবিধানিক ভাবেই। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল, (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। সংবাদপত্র শিল্প এবং সাংবাদিকতা পেশাকে নিরপেক্ষ এবং জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে তাঁরই নির্দেশে ও উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণীত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক চক্রের হাতে তিনি সপরিবার নিহত হন। তিনি তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন পুরোপুরি দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের আজকের যে সাফল্য তা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নেরই বাস্তব রূপরেখা।

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি তাঁর জন্মভূমি টুঙ্গিপাড়ার মানুষদের, নেতাকর্মীদের চিনতেন। তাঁদের নাম, ভালোমন্দ সব বিষয়ই তাঁর স্মরণে থাকত। রাজনীতির বাইরে কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, শিল্পী, আমলা, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক– সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। বিশেষ করে সাংবাদিকদের সাথে। টুঙ্গিপাড়ার খোকা থেকে একটি জাতির মুক্তিদাতা ও স্বাধীনতার স্থপতি হয়ে ওঠার পেছনে ছিল সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের অন্যতম অবদান। যা তিনি সব সময় উপলব্ধি করতেন। আর তিনি নিজেও কিছুদিন এ পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। এ কারণে ১৯৭২ সালে ১০ই জানুয়ারি প্রায় নয় মাসের বন্দিশালা থেকে দেশের মাটিতে পা দেবার পরপরই

উন্নয়নের অন্যান্য কর্মসূচির বাস্তবায়নের সাথে সাথে এই পেশার উন্নয়নের দিকে নজর দেন। এই পেশার দায়িত্ব কী, কীভাবে এই পেশার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো যায়–এই বিষয়গুলো তিনি বিভিন্ন সময় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বক্তব্যে তুলে ধরেছিলেন। ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। এদিন তিনি তাঁর ভাষণে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> মাননীয় সভাপতি, সুধীবৃন্দ ও সাংবাদিক ভাইয়েরা, আপনারা জানেন, আপনাদের অনেক সহকর্মী শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁরা আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। আমি অনেকদিন তাঁদের সঙ্গে জেলখানায় কাটিয়েছি। এবারের সংগ্রামে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নাই। তেমনি ৩০ লক্ষ লোক, যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য, তাঁদের কথা চিরদিন আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে এবং যে আদর্শের জন্য তাঁরা জীবন দিয়েছেন, সে আদর্শে যদি বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়, তাহলে তাঁদের আত্মা শান্তি পাবে।
>
> সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমার কয়েকটা স্পষ্ট আরজ আছে। আপনারা জানেন, বিপ্লবের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা এসেছে এবং সে বিপ্লব ছিল রক্তক্ষয়ী। এমন বিপ্লবের পরে কোন দেশ কোন যুগে এতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নাই, যা আমরা করছি। আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। এজন্য আপনাদের কোনো কাজে কখনো কোনোরকম হস্তক্ষেপ করি নাই।

সাংবাদিকতার আদর্শ সম্পর্কে তিনি সেদিন বলেছিলেন,

> আপনারা খবরের কাগজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা– এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি এবং এইসব আদর্শের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, এটাও আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। আমরা এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতেই দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাই। কিন্তু গণতন্ত্রেও একটা মূলনীতি আছে। গণতন্ত্রের অর্থ পরের ধন চুরি, খুন-জখম, লুটতরাজ বা পরের অধিকার হরণ করা নয়। তার জনকল্যাণমূলক একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও এমনই একটা মূলনীতি আছে।

সংবাদপত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন,

> আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন। আমিও বলি। কিন্তু কোনো কোনো খবরের কাগজে এমন কথাও লেখা হয়, যা চরম সাম্প্রদায়িক। অথচ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চব্বিশটি বছর প্রগতিশীল সাংবাদিকগণ সংগ্রাম করেছেন। আমরা সংগ্রাম করেছি, বাংলার মানুষ সংগ্রাম করেছে। আমাদের ছেলেরা, কর্মীরা জান দিয়েছে, জেল খেটেছে। সে নীতির বিরুদ্ধে যদি কোনো সাংবাদিক লেখেন, তাহলে আপনারা কী করবেন? এটাও আপনাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন। (সূত্র: *নিরীক্ষা*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, জুলাই-আগস্ট, ২০১৩, পৃষ্ঠা নং, ৭-৯, ১৮-১৯)

বঙ্গবন্ধুর সাংবাদিক জীবন

বঙ্গবন্ধু নিজেও কিছুদিন সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন দৈনিক *ইত্তেহাদ* পত্রিকার পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি। তবে তিনি নিজেই যে সংবাদকর্মী বা সাংবাদিক ছিলেন, সে কথা কখনও কোনো ভাষণে তিনি উল্লেখ করেননি। এ তথ্যটি জানা যায় ২০১২ সালে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থ থেকে। সেখানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর সাংবাদিক জীবনের নানা কথা। কলকাতা থেকে চল্লিশের দশকে *দৈনিক আজাদ*-এর পর মুসলমানদের উদ্যোগে দৈনিক *ইত্তেহাদ* নামে আরও একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। *ইত্তেহাদ* কেন প্রকাশিত হয়েছিল এবং এর প্রকাশনার পেছনে কারা ছিলেন সে প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> ... হাশিম সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতি হতে চাইলেন। কারণ, মওলানা আকরম খাঁ সাহেব পদত্যাগ করেছিলেন। শহীদ সাহেব রাজি হন নাই। মওলানা সাহেবকে অনুরোধ করে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়েছিলেন। হাশিম সাহেব রাগ করে লীগ সেক্রেটারি পদ থেকে ছুটি নিয়ে বর্ধমানে চলে গিয়েছিলেন। যখন তিনি কলকাতা আসতেন মিল্লাত প্রেসেই থাকতেন। হাশিম সাহেব এই সময় ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের অনেকেরই মোহ তাঁর ওপর থেকে ছুটে গিয়েছিল।
>
> সে অনেক কথা। তিনি কলকাতা আসলেই শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। এর প্রধান কারণ ছিল *মিল্লাত* কাগজকে দৈনিক করতে সাহায্য না করে তিনি *ইত্তেহাদ* কাগজ বের করেছিলেন– নবাবজাদা হাসান আলী সাহেবের ব্যবস্থাপনা এবং আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের সম্পাদনায়।

The Bangladesh Times
President visits DU today
By A Staff Reporter
Meets governors, dist secys
THE BANGLADESH OBSERVER
BANGOBANDHU VISITS D.U. TODAY
Hearty welcome will be accorded
দৈনিক বাংলা
বঙ্গবন্ধু আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন
দৈনিক ইত্তেফাক
বঙ্গবন্ধু আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন

> মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের *দৈনিক আজাদও* ক্ষেপে গিয়েছিল শহীদ সাহেবের ওপর। কারণ, পূর্বে একমাত্র *আজাদ* ছিল মুসলমানদের দৈনিক পত্রিকা। এখন আর একটা কাগজ বের হওয়াতে মওলানা সাহেব যতটা নন, তাঁর দলবল বেশি রাগ করেছিল। [শেখ মুজিবুর রহমান: *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ২০১১, পৃষ্ঠা-৭২]।

বঙ্গবন্ধুর এই লেখা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, দৈনিক *ইত্তেহাদ* বের হওয়ার পেছনে তৎকালীন বাংলার মুসলিম লীগের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব কাজ করছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী একদিকে যেমন মওলানা আকরাম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক *আজাদের* প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন, তেমনি আবুল হাশিমদের *মিল্লাত* পত্রিকার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর অনুসারী আবুল মনসুর আহমদকে সম্পাদক করে নতুন কাগজ প্রকাশিক হলো *দৈনিক ইত্তেহাদ*।

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করার পর পর দেশের বেশ কিছু সংবাদপত্র নানা বিষোদ্‌গার করতে শুরু করে, যা ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের উন্নয়নের পথে অন্তরায়। এ সময় দেশে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১৭ শতাংশ। কিন্তু পত্রিকার সংখ্যা ছিল শত শত। ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই সাংবাদিক ইউনিয়নের সম্মেলনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি আরও বলেছিলেন,

> আপনারা দাবি করেছিলেন, আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় যেন কোনোদিন হস্তক্ষেপ না করি। কিন্তু আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আদর্শ আছে, সেগুলো মানলে কি মিথ্যা কথা লেখা যায়? রাতারাতি একটা কাগজ বের করে, বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে কেউ যদি বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা সহ্য করবেন না। কারণ, তা আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করবে। 'ওভারসিজ পাকিস্তান' নামে কোনো সংস্থা যদি এখন থেকে খবরের কাগজ প্রকাশ করে, তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আপনারা কী সামান্য কিছু লোকের স্বার্থ দেখবেন নাকি, যে ৩০ লক্ষ লোক রক্ত দিয়েছে, তাঁদের স্বার্থ দেখবেন? বিপ্লবের পরে এদেশের সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তা এদেশে আর কখনো ছিল না। এই জন্যই রাতারাতি খবরের কাগজ বের করেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ ছাপানো হয়, 'এক লক্ষ বামপন্থি হত্যা', 'বিমানবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ' ইত্যাদি। কিন্তু এসব কি লেখা উচিত? এসব কার স্বার্থে ছাপানো হয়?

তিনি যেহেতু ছিলেন সাংবাদিকদের বন্ধু তাই চেয়েছিলেন এই পেশাকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে। এলক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন সময় সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ ও সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করতেন। সে সময়ের সিনিয়র সাংবাদিক ও নেতৃবৃন্দের অনেকেই মত প্রকাশের নামে এই হলুদ সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। এই সাংবাদিকদের নিয়ে তিনি একটি কমিটি করে দিয়েছিলেন বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য। এই কমিটির পরামর্শে চাকরি কাদের থাকবে– না থাকবে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হতো। এই কমিটির পরামর্শক হিসেবে যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সরকারের প্রতিনিধি, সাংবাদিকদের প্রতিনিধি ও সংসদ সদস্য বৃন্দ। এরা হলেন– মিজানুর রহমান সম্পাদক *এনা* (বর্তমান *বাসস*), অধ্যাপক এ খালেদ এমপি, আমানুল্লা খান এমপি, আনিসুজ্জামান খান, সলিমুজ্জামান উপসচিব, গিয়াস কামাল চৌধুরী মহাসচিব, ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (সূত্র: আবু জাফর শামসুদ্দীন, 'অপ্রকাশিত ডায়েরি', ঈদ সংখ্যা, দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২০১২, পৃ:৬৬, ৭১)।

বঙ্গবন্ধুর সেই পথ ধরে সাংবাদিকদের পেশাগত উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারের বিভিন্ন মেয়াদে সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সাংবাদিকদের কল্যাণে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে। করোনায় মৃত্যুবরণকারী সাংবাদিক পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের জন্য নবম ওয়েজবোর্ড গঠন ও গণমাধ্যম কর্মীদের পেশাগত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রেস ক্লাবগুলোকে আধুনিকায়ন করে তোলার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে গড়ে তোলা হচ্ছে ৩১ তলা বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু মিডিয়া সেন্টার, যেখানে সাংবাদিকরা পাবে পেশাগত সবধরনের সুযোগ। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারে সংবাদমাধ্যম। তবে তা হতে হবে নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের কাজ হয়েছে বহুমাত্রিক। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ করে সংবাদপত্র ও সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য যে নীতিমালা ও আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে তা দেশে হলুদ সাংবাদিকতা প্রতিরোধে সহায়ক হয়েছে। অন্যান্য গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও এই নীতিমালা, আচরণবিধি অবশ্য প্রযোজ্য হতে যাচ্ছে। আর এভাবেই এই পেশার দায়িত্ববোধ আরও শক্তিশালী এখন।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, গণমাধ্যম গবেষক ও সাংস্কৃতিক কর্মী

নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ কনস্যুলেটে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালিত

মুজিববর্ষ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে ২১শে আগস্ট বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ও নিউইয়র্ক ব্লাড সেন্টার যৌথভাবে নিউইয়র্কের কুইন্স প্লেস মল প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে।

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু এবং কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্য ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করে তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। সিনেটর জন ল্যু 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানিয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তিনি কনসাল জেনারেলকে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী ও ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কে করোনাজনিত কারণে রক্তের চরম সংকটকালে নিউইয়র্ক ব্লাড সেন্টারের সহযোগিতায় কনস্যুলেট স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে। কনস্যুলেট জেনারেল ভবিষ্যতেও কমিউনিটির চাহিদা অনুযায়ী এ ধরনের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে তিনি জানান। এসময় কনস্যুলেট কর্তৃক প্রত্যেক রক্তদাতাকে রক্তদানের জন্য প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: কানিজ ফাতেমা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকীতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন– পিআইডি

পনেরোই আগস্ট

জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের কালিমালিপ্ত বেদনাবিধুর শোকের দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে মানবতার শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতকচক্রের হাতে বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলনের মহানায়ক, বিশ্বের লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের মহান নেতা, বাংলা ও বাঙালির হাজার বছরের আরাধ্য পুরুষ, বাঙালির নিরন্তন প্রেরণার চিরন্তন উৎস, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করা হয়।

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বাণীতে বলেন, আজ জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী। বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ই আগস্ট এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ১৯৭৫ সালের এদিনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের নির্মম বুলেটের আঘাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে শাহাদতবরণ করেন অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একই সাথে শহিদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ অনেক নিকটাত্মীয়। এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা কেবল দেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপোশহীন উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। দীর্ঘ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই মহান নেতা ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', যা ছিল মূলত স্বাধীনতারই ডাক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বাণীতে রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই আমাদের দায়িত্ব হবে জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। তাহলেই চিরঞ্জীব এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তাই আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আত্মনিয়োগ করি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণীতে বলেন, ১৫ই আগস্ট আমাদের জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে ঘাতকরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করে।

জাতির পিতার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন পুত্র– বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, দশ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ আবু নাসের, কৃষকনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত, সাংবাদিক শহীদ সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮জন সদস্যকে ঘৃণ্য ঘাতকরা এ দিনে হত্যা করে। জাতীয় শোক দিবসে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ১৫ই আগস্টের সকল শহিদকে এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত,

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ই আগস্ট ২০২১ তথ্য ভবনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আলোচনাসভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র তাঁকে পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ হত্যা করে। এই হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। ঘাতকদের উদ্দেশ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করা। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের পর থেকেই হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। তারা ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথকে বন্ধ করে দেয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠন করে। অতীতের জঞ্জাল সরিয়ে ১৯৯৬ থেকে ২০০১– এই পাঁচ বছরে দেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নের এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। আমরা জাতির পিতার হত্যার বিচার শুরু করি। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে এই হত্যার বিচার কাজ বন্ধ করে দেয়।

দেশের জনগণ ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রেখে যাওয়া অচলাবস্থা এবং বিশ্বমন্দা কাটিয়ে আমরা দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করি। গত সাড়ে ১২ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বে 'রোল মডেল' হয়েছে। আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি। এই সময়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। বর্তমান প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের মহামারির মধ্যেও আমরা আমাদের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আশা করি, জাতির পিতার হত্যার ষড়যন্ত্রের পেছনে কারা ছিল সেটাও একদিন বের হয়ে আসবে। জাতীয় চারনেতা হত্যার বিচারও সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ বন্ধ হয়েছে। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্রবিরোধী চক্রের যে-কোনো অপতৎপরতা-ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আসুন, আমরা জাতির পিতা হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করি। তাঁর আত্মত্যাগের মহিমা এবং দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনাদর্শ আমাদের কর্মের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে সকলে মিলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি– জাতীয় শোক দিবসে এই হোক আমাদের সুদৃঢ় অঙ্গীকার।

বঙ্গভবনে দরবার হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। মাহফিলে রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্য, রাষ্ট্রপতির সচিবগণ, বঙ্গভবনের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণ অংশ নেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী। জাতির পিতার সম্মানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ওই সময় সশস্ত্রবাহিনীর একটি চৌকস দল বঙ্গবন্ধু ও ১৫ই আগস্টের শহিদদের সম্মান জানিয়ে রাষ্ট্রীয় সালাম জানায়; বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর। পরে সংক্ষিপ্ত মোনাজাতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে তিনি যান বনানী কবরস্থানে। সেখানে ১৫ই আগস্টের শহিদদের কবরে শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধুকন্যা।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১৫ই আগস্ট ২০২১ তথ্য ভবনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী' ঘুরে দেখেন –ফটোফিচার: মো. নাজিম উদ্দিন

প্রধানমন্ত্রী ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ছাড়ার পর সকাল সাতটায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, ১৫ই আগস্ট নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পেছনের কুশীলবদের খুঁজে বের করতে আলাদা তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। তিনি বলেন, জাতির পিতার হত্যার বিচার করে ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। এর বাইরে যারা ষড়যন্ত্রকারী ছিল, তদন্ত কমিশন করে তাদেরও খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনা হবে।

শোক দিবসের প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের ক্ষণে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু ভবন ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সব দলীয় কার্যালয়ে উত্তোলন করা হয় কালো পতাকা; অর্ধনমিত রাখা হয় জাতীয় পতাকা। সকাল পৌনে ৮টায় বনানী কবরস্থানে ১৫ই আগস্টের শহিদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো। পাশাপাশি সেখানে অনুষ্ঠিত হয় মোনাজাত, দোয়া ও মিলাদ।

জোহরের নামাজের পর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সব মসজিদে হয় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত। পাশাপাশি সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতেও হয় বিশেষ প্রার্থনা। সকাল সাড়ে ১০টায় টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল। কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে সেখানে অংশ নেন স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও। দুপুরে অসচ্ছল ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয় খাবার। আর আছরের নামাজের পর আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহিলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে হয় মিলাদ ও দোয়া।

১৫ই আগস্ট রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনাসভা এবং চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে যারা বঙ্গবন্ধুকেই অস্বীকার করে, তাদের রাজনীতি করার অধিকার থাকা উচিত নয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ঘটনা নিছক হত্যাকাণ্ড নয়, এর পেছনে গভীর দুরভিসন্ধি ছিল উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, শুধু বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা থেকে সরানো নয়, এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই একাত্তরের পরাজিত দেশি-বিদেশি অপশক্তি এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মকে ঠিক ইতিহাস জানাতে জিয়াউর রহমানসহ এই হত্যার নেপথ্যের কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচনে কমিশন গঠন এখন সময়ের দাবি বলেন তিনি।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক সোহরাব হোসেন, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমদ কামরুজ্জামান, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম ও চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া তাদের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করেন। বঙ্গবন্ধু স্মরণে এসময় কবিতা আবৃত্তি করেন ড. শাহাদত হোসেন নিপু ও তামান্না তিথি, প্রদর্শিত হয় প্রামাণ্যচিত্র *চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু*। শুরুতেই অতিথিদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করে ঘুরে দেখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

এদিকে ১৫ই আগস্ট জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে জাতীয় শোক দিবসে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শহিদদের স্মরণে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন ও পতাকা অর্ধনমিতকরণ, আলোচনাসভায় সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া, অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

এছাড়া জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে ১৫ই আগস্টের সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে তিনটি পৃথক ডিজাইনের মুদ্রিত পোস্টার প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তাদের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেন। দেশের বাইরেও বিভিন্ন বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় শোক দিবস যথাযথভাবে পালন করা হয়।

সচিত্র বাংলাদেশ ডেস্ক প্রতিবেদন

নজরুল জীবনে নয় সংখ্যার বিস্ময়কর সমীকরণ

মনজুর-ই-আলম ফিরোজী

আমাদের জাতীয় কবি, গণমানুষের কবি, মানবতার কবি, দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মহাসাগরের বিশাল জলরাশির মতো স্বচ্ছ, তেজোদীপ্ত মহিরুহ। বট-পাকুড় গাছের সুবিস্তৃত ছায়ার মতোই তিনি মহান। বিচিত্র ও বহুবিধ ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র ও কর্মধারা। জাতীয় কবির সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার আগে তাঁর জন্ম, জীবদ্দশা, মৃত্যু তথা সমগ্র জীবন পরিক্রমায় নয় সংখ্যার বিস্ময়কর যোগসূত্রের কিছু প্রমাণক তুলে ধরা হলো।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ এবং মাতার নাম জাহেদা বেগম। মাত্র নয় বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রামের মক্তব থেকে নজরুল নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯১৭ সালে তিনি যখন সৈনিক হিসেবে বাঙালি পল্টনে যোগ দেন তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে যখন বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয় এবং তিনি সৈনিক জীবনের ইতি টানেন তখন ছিল ১৯১৯ সাল।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায় নজরুলের প্রথম কবিতা 'মুক্তি' ছাপা হয়। মুজফ্ফর আহমদের লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট নজরুল পত্রিকা সম্পাদকের নিকট চিঠি লেখেন তাঁর কবিতাটি পত্রিকায় ছাপানোর জন্য।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে *সওগাতের* জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় নজরুলের প্রথম গল্প 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' ও কার্তিক সংখ্যায় নজরুলের প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্কী মহিলার ঘোমটা খোলা' প্রকাশিত হয়। ডিসেম্বরের ১৯১৯ সালে নজরুলের প্রথম অনুবাদ কবিতা পারসি কবি হাফিজের লেখা 'আশায়' প্রকাশিত হয়।

নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র প্রকাশকাল ১৯২১ সাল হলেও সেটির রচনাকাল ১৯১৯ সাল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় খান মুহম্মদ মঈনুদ্দিনকে লেখা নলিনীকান্ত সরকারের একটি চিঠি থেকে। 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে নজরুল একদিকে নির্যাতিত মানুষের শ্রদ্ধাভাজন বনে যান, অপরদিকে ইংরেজ শাসককুলের চোখের বালি এবং আরও অনেকের চক্ষুশূলে পরিণত হন। বাংলা ১৩২৯ সালে *ইসলাম দর্শন* পত্রিকার সম্পাদক আবদুল হাকিম কার্তিক সংখ্যায় 'বিদ্রোহ দমন' শীর্ষক কবিতায় নজরুলকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেন। বস্তুত নানা কারণে ১৯১৯ সালটি ছিল নজরুলের জীবনে ঘটনাবহুল বছর।

১৯২০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরু অংশ নেন। এ অনুষ্ঠানে *নবযুগের* প্রতিনিধি হিসেবে কাজী নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদ অংশগ্রহণ করেন। এ অধিবেশন থেকেই গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

১৯শে ডিসেম্বর ১৯২০ সালে দেওঘরে ডা. কার্তিকচন্দ্র বসুর স্যানাটোরিয়াম থেকে নজরুল *সবুজ* পত্রিকার দপ্তরে কর্মরত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন।

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নিবীণা* প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে (১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে)।

বাংলা ১৩২৯ সালে (১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে) নজরুলের প্রবন্ধগ্রন্থ *যুগবাণী* প্রকাশিত হয়। রাজদ্রোহের অপরাধে ইংরেজ সরকার *যুগবাণী* বেআইনি ঘোষণা করে এবং এর সকল কপি বাজেয়াপ্ত করে।

বাংলা ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে চট্টগ্রামের হাফিজ মাসউদ নামে একব্যক্তি একটি রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য মুজফ্ফর আহমদকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এজন্য তিনি ২৫০ টাকা মূলধন প্রদানের নিশ্চয়তা দেন। এত অল্প টাকায় এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশ বাস্তবতাবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও নজরুল নিজস্ব পত্রিকা পাওয়ার আগ্রহে উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবে সম্মত হন। তিনি নিজেই পত্রিকার নাম ঠিক করেন *ধূমকেতু*। ঠিক হয় আফজাল-উল-হক হবেন পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর।

ধূমকেতু পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ২২শে শ্রাবণ ১৩২৯ আশীর্বাণী লিখে দেন।

৯ই আগস্ট ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে (২৪শে শ্রাবণ ১৩২৯) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিবপুর থেকে *ধূমকেতু* পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে নজরুলকে দেওয়া এক শুভেচ্ছাপত্রে লেখেন, 'আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার'।

২৬শে শ্রাবণ ১৩২৯ তারিখে *ধূমকেতু* পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়।

নজরুলের প্রিয়পুত্র বুলবুলের জন্ম ৯/৯/১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে (অকাল মৃত্যু ৭ই মে, ১৯৩০ খ্রি.)।

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ (১৩২৯ সালের ২৯শে ভাদ্র) তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের বিজয়ে তুর্কি দিবস পালিত হয়। কলকাতার টাউন হলে আহুত সভায় কামাল আতাতুর্কের বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। নজরুল ঐ শোভাযাত্রায় অংশ নেন এবং মনের আনন্দে গাইতে থাকেন তাঁর রচিত 'কামাল পাশা' কবিতার চরণ 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।'

ধূমকেতু পত্রিকার ৯ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালের ২৯শে ভাদ্র (১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২২) তারিখে।

ধূমকেতু পত্রিকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে আগুন ঝরানো সম্পাদকীয় লেখা হতে থাকে। যেমন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায় লেখা হয়– '... ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।'

ব্রিটিশ ভারতে সে সময় ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন ছিল অভাবনীয় সাহসী পদক্ষেপ। *ধূমকেতু*'র পূজা সংখ্যায় তাঁর কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হয়। ঐ কবিতাটি প্রকাশের সাথে সাথে ব্রিটিশ তখতের ভীত কেঁপে ওঠে এবং খসে পড়ার উপক্রম হয়।

রাজদ্রোহিতার অভিযোগে সরকার সম্পাদক নজরুল ও প্রকাশক আফজাল-উল-হকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। নজরুল গ্রেপ্তার এড়াতে কুমিল্লা চলে যান। ২৩শে নভেম্বর ১৯২২ নজরুলকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৯শে নভেম্বর ১৯২২ কলকাতার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নজরুলের রাজদ্রোহিতা মামলার শুনানি শুরু হয়।

প্রহসনমূলক বিচারে ১৬ই জানুয়ারি ১৯২৩ তারিখে বিচারক সুইনহো রায় প্রদান করেন এবং নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। ১৪ই এপ্রিল ১৯২৩ তারিখে নজরুলকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে হুগলি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

হুগলি জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন সময়ে কয়েদিদের ওপর জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের প্রতিবাদে কাজী নজরুল অনশন শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ মনীষীগণ নজরুলের অনশন ভাঙানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন, টেলিগ্রামও করেন। যদিও ঐসব চিঠি, টেলিগ্রাম প্রেরকের কাছে ফেরত পাঠায় কারা কর্তৃপক্ষ। অবশেষে কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে ৩৯ দিন পরে ২৩শে মে ১৯২৩ তিনি অনশন ভাঙেন।

৯ই এপ্রিল ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ি ও তাঁর গোষ্ঠীর উদ্যোগে নজরুলকে এক সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সরকার ফৌজদারি বিধির ৯৯-এ ধারা অনুসারে নজরুলের কবিতার বই ভাঙার গান নিষিদ্ধ করে। ব্রিটিশ সরকার কখনোই এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেনি। দেশ বিভাগের পর ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।

নজরুলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *রিক্তের বেদন* প্রকাশ করে ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিকেশনস, যার ঠিকানা ২৬/৯/১ হ্যারিসন রোড, কলকাতা।

১৯শে নভেম্বর ১৯২৫-এ নজরুল হুগলিতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। আবদুল হালিম, কবিপত্নী প্রমীলা ও শ্বাশুড়ি গিরিবালা দেবীর সেবাযত্নে তিনি আরোগ্যলাভ করেন।

৯ই অক্টোবর ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরের বাড়িতে সকাল ৬ টায় কবির দ্বিতীয় পুত্র অরিন্দম খালেদ বুলবুলের জন্ম হয়।

৯ই আগস্ট ১৯২৭ সালে কলকাতায় সুর-সুন্দর নলিনীকান্ত সরকারকে *বাঁধনহারা* পত্রোপন্যাস উৎসর্গ করেন।

২৯শে জানুয়ারি নজরুল ঢাকায় 'চল চল চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটি লেখেন। এটি ঢাকায় *শিখা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯২৮ সালের ২৯শে মে চুরুলিয়ায় নজরুলের মা জাহেদা খাতুনের মৃত্যু হয়।

৯ই অক্টোবর ১৯২৮ সালে কবি নজরুলকে সমগ্র বাংলার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্দেশে কলকাতার ওয়েলেসলি স্ট্রিটে খান বাহাদুর আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে কবি নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তখন কবির বয়স ছিল ২৯ বছর ৬ মাস ২১ দিন। সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

১৯২৯ সালের ৯ই অক্টোবর কবিপুত্র সব্যসাচী জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৩৩ সালে মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় কাজী নজরুল অনূদিত রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম-এ ৫৯টি 'রুবাই' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেই ৫৯টি 'রুবাই' গ্রন্থাকারে প্রস্তুতের সময় কবি অনেক পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন করেছিলেন। কবির অসুস্থতার অনেক পরে সেটি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

কালকাতার ৯ অ্যান্থনি বাগান লেনস্থ করিম বখশ ব্রাদার্স ১৯৩৩ সালে কবি নজরুলের কাব্য *আমপারা* ছাপায়।

১৯৩৯ সালে কবির জীবনে আরেকটি মর্মান্তিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। কবিপত্নী প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন।

৯ই জুলাই ১৯৪২ সাল কবি নজরুলের জীবনের এক চরম দুঃখ বারতার দিন। এদিন কবির জটিল অসুখের সূচনা হয়।

অসুখ ধরা পড়ার পর দোর্দণ্ড তেজী প্রতিভাবান কবির জীবনে ছন্দপতন ঘটে। অসুস্থ কবিকে ভারতে চিকিৎসায় অসাফল্যের পর উন্নত চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রথমে লন্ডন ও পরে ভিয়েনা পাঠানো হয়। সেখানে ডাক্তার হ্যান্সহপ কবির ওপর সেরিব্রাল এনজিওগ্রাফি করেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, কবি পিকস ডিজিজে আক্রান্ত। এ দিনটি ছিল ১৯৫৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর।

১৯৬৯ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজরুলের ৭০তম জন্মজয়ন্তীতে কবির প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেখান এবং প্রদেশব্যাপী তাঁর জন্মোৎসব পালন করে।

১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট বিদ্রোহী কবি ৭৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কবির অমর কবিতা/গান/গজল এ মহান কবির মহান ইচ্ছা 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই, যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই'-এর আহ্বানটি রক্ষা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের উত্তর পাশে সমাহিত করা হয়।

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ও ভারতে জাতীয়ভাবে কবির জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

২০০৯ সালে কবির ১১০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনকালে/অতিক্রমকালে বিএসবি ক্যামব্রিয়ান কলেজ নজরুল বক্তৃতামালা চালু করে।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক খান মুহম্মদ মঈনুদ্দিনের মতে 'বিদ্রোহী' কবিতার রচনাকাল ১৯১৯। সে মতে ২০০৯ সালে বিদ্রোহী কবিতা রচনাকালের ৯০ বছর পূর্ণ হয়। অন্য বর্ণনায়, 'বিদ্রোহী'র রচনাকাল ১৯২১ সাল ধরে ২০১১ সালে বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশকালের ৯০ বছর পূর্ণ হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের তথ্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তা ঘটা করে পালন করা হয়।

অনেক মনীষীর জীবনেই কিছু সংখ্যার শুভাশুভের দুই/একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবির জীবনে নয় সংখ্যাটির ব্যাপক যোগাযোগ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিশেষ করে তাঁর জন্ম-মৃত্যু, সন্তানদের জন্ম-মৃত্যু, পিতার মৃত্যু, মাতার মৃত্যু, স্ত্রীর অসুস্থতা ইত্যাদি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোতে নয় সংখ্যাটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। সত্যি অবাক করার মতো বৈকি!

তথ্যসূত্র

১। *নজরুল রচনাবলী (১-১২ খণ্ড)*, সম্পাদনা: ড. রফিকুল ইসলাম প্রমুখ (প্রথম সংস্করণের সম্পাদক– কবি আব্দুল কাদির), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল মে ২০১০ খ্রি.।

২। *তোমার সম্রাজ্যে যুবরাজ*, সম্পাদনা: হায়াত মামুদ ও জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, প্রকাশকাল–সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ খ্রি.।

৩। *বাংলা পিডিয়া*, সম্পাদনা: সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, প্রকাশকাল– জুন ২০১১ খ্রি.।

৪। *নজরুল তারিখ অভিধান*, রচনা: মাহবুবুল হক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল–জুন ২০১০ খ্রি.।

লেখক : প্রাবন্ধিক, অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার, সিএএফও-এর কার্যালয়, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, ঢাকা

আধুনিক রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবের মহাপ্রয়াণ

রহিম আব্দুর রহিম

বাহান্নর মহান ভাষা আন্দোলনেই বঙ্গবন্ধুর মনোজগতে বাংলাদেশ বিনির্মাণের চেতনা গ্রথিত হয়। সে থেকেই নিপীড়িত বাঙালি জাতির মুক্তির জন্যই তিনি আজীবন সংগ্রাম করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক দেশ বিনির্মাণের ইঙ্গিতও স্পষ্ট করেন। তিনি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেন– 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারির মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।' ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'। অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ও মননচর্চার সামগ্রিক মুক্তির ইঙ্গিত দিয়েই বঙ্গবন্ধুর আধুনিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। সেই চেতনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর গণতান্ত্রিক আধুনিক বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর আধুনিক চিন্তাচেতনা বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ সব খাতে এখনো প্রতিফলিত হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি কেরানি নয়, কর্মঠ জাতি গঠনে দিয়ে গেছেন আধুনিক সময়োপযোগী শিক্ষানীতি। সকল বিতর্কের উর্ধ্বে রেখে শিক্ষা খাতকে তিনি আধুনিকায়নে মেধা-মনন প্রয়োগ করেছেন। মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান তাঁরই অবদান। স্বাধীন দেশের পবিত্র সংবিধানে জাতির কর্ম-কল্যাণের গভীর চিন্তা প্রস্ফুটিত হওয়ায় আজ উন্নত বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো সক্ষম বাংলাদেশ।

এক সময় নদীমাতৃক বাংলায় পারাপারে বাঁশের সাঁকো, কাঠের ব্রিজ ছিল। এখন অত্যাধুনিক বাংলাদেশে উন্নত ব্রিজ, কালভার্ট, সর্বোপরি দৃষ্টিনন্দন পদ্মা সেতু দৃশ্যমান। মানুষের নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে বঙ্গবন্ধুর দর্শন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। সুশাসন নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধুর দর্শন অনুসরণে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার সুফল বর্তমান জাতি ভোগ করছে। কৃষি ক্ষেত্রের আধুনিকায়নে প্রান্তজনের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে কৃষকদের ব্যবহৃত আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, ন্যায্যমূল্যে উন্নত কৃষিবীজ ও সার-কীটনাশক। এক সময়কার অভাব-অনটনের এই ভূখণ্ড বর্তমানে উন্নয়নের মহাসড়কে। যোগাযোগ ক্ষেত্রে জাতির পিতার চিন্তাচেতনা প্রতিফলিত হওয়ায় রাস্তাঘাট, স্থলপথ, নৌপথ, আকাশপথে এদেশের সঙ্গে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশের যোগাযোগ এখন হাতের মুঠোয়। চা শিল্প, গার্মেন্টস শিল্প ও কুটিরশিল্পসহ সব শিল্পের উন্নয়ন এগিয়ে চলছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষরাও ভোগ করছে বৈদ্যুতিক সুবিধা। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বিশ্বের ৫৭টির একটি। যার মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ, মোবাইল নেটওয়ার্ক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়-বৃষ্টি–জলোচ্ছ্বাস সর্ম্পকে তথ্য দ্রুত পাওয়া যাচ্ছে।

বর্তমানে ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত। পুষ্টি-প্রোটিন এবং হাতের কাছে চিকিৎসা সেবা থাকায় মাতৃমৃত্যু প্রায় শূন্যের কোঠায়। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনসহ অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে অগ্নিনির্বাপক

উপকরণের ব্যবস্থা করাতেও বঙ্গবন্ধুর আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের দর্শন প্রতিফলিত হচ্ছে। বাসস্থানের উন্নয়নে হতদরিদ্রদের জন্য একটি বাড়ি একটি খামার, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, উপবৃত্তি, মাতৃত্বকালীন ভাতার সকল কিছুরই পেছনে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর-ই দর্শন। অসাম্প্রদায়িক চেতনার মহান নেতা আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' দর্শনে বিশ্বাসী।

ভারত-বাংলাদেশ দীর্ঘদিনের সীমান্ত জটিলতা নিরসনে বঙ্গবন্ধুই ১৯৭৪ সালে 'মুজিব-ইন্দিরা' চুক্তি করেছিলেন। ২০১৫ সালে যে চুক্তির বাস্তবায়ন হওয়ায় উভয় দেশের ৫৫ হাজার মানুষ সভ্য পৃথিবীর আধুনিকতার ছোঁয়া পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর আধুনিক দর্শন এতই গভীর যে, বিশ্ব গণমাধ্যমের চোখে তিনি ছিলেন এক ঐতিহাসিক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। দেশি-বিদেশি ভক্ত এমনকি সমালোচক-শত্রুরাও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন।

শ্রীলঙ্কার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'দক্ষিণ এশিয়া গত কয়েক শতকে বিশ্বকে অনেক শিক্ষক, দার্শনিক, দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক নেতা ও যোদ্ধা উপহার দিয়েছেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর স্থান নির্ধারণ করেছেন সর্বোচ্চ আসনে। তিনি বাঙালি জাতির স্বপ্ন পূরণ করেছেন। তাদেরকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন।' ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের ভাষায়, 'বঙ্গবন্ধু ঐশ্বরিক আগুন এবং তিনি নিজেই সে আগুনে ডানাযুক্ত করতে পেরেছিলেন।' ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জে এন দীক্ষিত বলেন, 'প্রথম সরকার, জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান উপমহাদেশে বাংলাদেশের পৃথক জাতিসত্তায় গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। শেখ মুজিব এই উপমহাদেশে স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশের পরিচয়ে তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।' ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফরে এসে বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান এই উপমহাদেশের গণতন্ত্রের এক প্রতিমূর্তি, এক বিশাল ব্যক্তিত্ব।' ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাবেক (বেলুচিস্তান) অফিসার মেজর জেনারেল তোজাম্মেল হোসেন মালিক তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, 'মুজিব দেশদ্রোহী ছিলেন না। নিজ জনগণের জন্য তিনি ছিলেন এক মহান দেশপ্রেমিক'। তৎকালীন পাকিস্তানি জান্তার মুখপাত্র মেজর সিদ্দিক মালিক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁর *পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল* গ্রন্থে লিখেছেন, 'রেসকোর্সের ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর ঘরমুখী মানুষের ঢল নামে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল আশাব্যঞ্জক বাণী শ্রবণ শেষে মসজিদ অথবা গির্জা থেকে তারা বেরিয়ে আসছেন।' তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্ট পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্য নিয়ে নতুন করে বাড়াবাড়ি করলে তার প্রতিক্রিয়া অনিবার্যভাবে পাকিস্তানি সীমান্তের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে।' সেনেগালের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আবদু দি উক ১৯৯৯ সালে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করে এই আফ্রিকান নেতা বলেন, 'আপনি এমন পরিবার থেকে এসেছেন, যে পরিবার বাংলাদেশকে অন্যতম মহান ও শ্রদ্ধাভাজন নেতা উপহার দিয়েছেন। আপনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশের জনগণ যথার্থই বাংলাদেশের মুক্তিদাতা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।' ড. পীযুষ কান্তি বড়ুয়া তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক উন্নয়নের সমন্বিত রূপ বোঝায়। এর মধ্যে অর্থনীতির আওতায় কৃষি, শিল্প, আমদানি-রপ্তানি। মানবিক উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-সাহিত্য, ক্রীড়া ও মানবসম্পদ।'

বঙ্গবন্ধুর আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই দর্শন সুস্পষ্ট, যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুস্থ-সবল জ্ঞান-চেতনায় সমৃদ্ধ কোনো রকম ভেদ-বৈষম্য-শোষণহীন, অসাম্প্রদায়িক একটি বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয় দফাতেই বঙ্গবন্ধুর আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের উর্বর বীজতলা।

১৯৭১ আমেরিকান মিশনারি জেনিন লকারবি তার *অন-ডিউটি ইন বাংলাদেশ* বইয়ে লিখেছেন, 'এমন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যে অনগ্রসর বাঙালি জাতিকে মুক্তির আস্বাদ দিয়েছেন তাঁর নাম শেখ মুজিব।' ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডস-এর সদস্য ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শীর্ষস্থানীয় যোদ্ধা ফেনার ব্রকওয়ে বলেছেন, 'সংগ্রামের ইতিহাসে লেলিন, বোজালিবার্গ, গান্ধী, নকুমা, লমুমবা, ক্যাস্ট্রো ও আলেন্দার সঙ্গে মুজিবের নাম উচ্চারিত হবে। তিনি বলেন, 'তাঁকে হত্যা করা ছিল মানবতা হত্যার চেয়ে অনেক বড়ো অপরাধ। শেখ মুজিব শুধু তাঁর জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেননি, তিনি তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।'

বিশ্ব বরেণ্য বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে খুনিরা বাঙালি জাতিকে মীর জাফরের কলঙ্কে কলঙ্কিত করে। মুজিব জন্মশতবর্ষে তাঁর উত্তরসূরি শেখ হাসিনাই বঙ্গবন্ধুর আধুনিক রাষ্ট্র কায়েমে বিশ্বে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা কি না খুনিদের উলটো রথের মাইলফলক। মুজিব অমর, মুজিবই উন্নয়ন, মুজিব মানেই আধুনিক রাষ্ট্রনায়ক।

লেখক: শিক্ষক, গবেষক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও শিশু সংগঠক

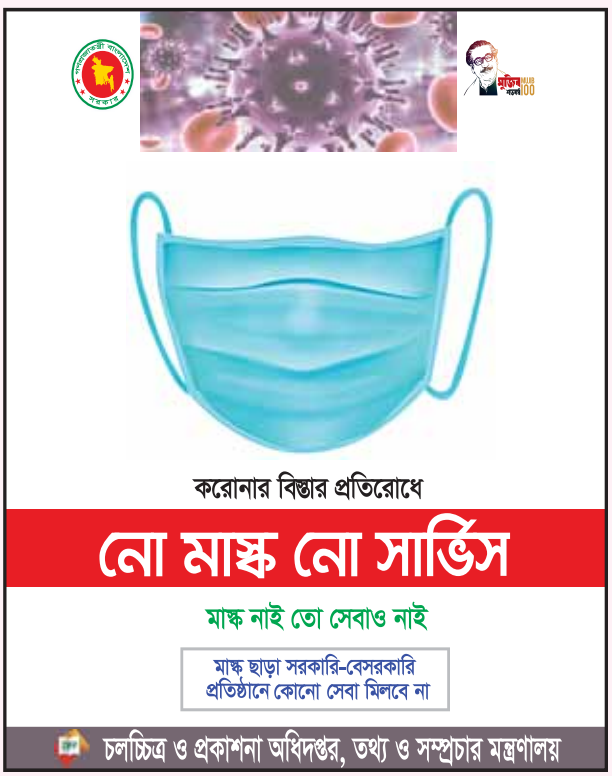

চিরভাস্বর বঙ্গবন্ধু

কে সি বি তপু

আগস্ট মাস বাঙালির শোকের মাস। পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস; ১৯৭৫ সালের এ দিনেই জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্যের বর্বর আক্রমণে বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার শহিদ হন। সেদিন বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠকন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং কনিষ্ঠকন্যা শেখ রেহানা। সে সময় শেখ হাসিনা জার্মানিতে তাঁর স্বামী বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে সন্তানসহ অবস্থান করছিলেন। শেখ রেহানাও ছিলেন বড়ো বোন শেখ হাসিনার সঙ্গে। বিশ্বে অনেক নেতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও খুব অল্পসংখ্যক নেতা ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন তেমনই ইতিহাসের এক অনন্য কালজয়ী মহানায়ক। বঙ্গবন্ধু উপস্থিত নেই যেমন সত্য, তেমনি তাঁর আপোশহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব ও দৃঢ় আদর্শ এখনো আমাদের পাথেয়। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব, বীরত্ব ও আদর্শ বিশ্ব ইতিহাসে চিরভাস্বর ও চিরকালীন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন সংগ্রামী নেতা। বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ ছয় দফার প্রণেতা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু নেতা হিসেবে এদেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন পূরণে ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলে ষাটের দশক থেকেই তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়কে পরিণত হন।

পাকিস্তান শাসনামলে লাহোর প্রস্তাবের মূলভিত্তি থেকে বিচ্যুতিতেই বাঙালির মোহভঙ্গ হয়। পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন পায়নি, বরং পেয়েছে বৈষম্য ও নিপীড়ন। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান শাসনামলে বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব সংবলিত ছয় দফা উত্থাপন করেন। পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে ছয় দফা দাবিনামা জনগণের কাছে তুলে ধরা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছয় দফার পক্ষে দেশব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করে আওয়ামী লীগ। বাংলার মানুষ ব্যাপকভাবে ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানান। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল, মে ও জুনে ছয় দফার দাবিকে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীকে ভাবিয়ে তোলে।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে কর্মসূচি স্তব্ধ করে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করা হলো দেশরক্ষা আইনে। আওয়ামী লীগের অন্যান্য প্রধান নেতাদেরও আটক করা হলো। শেখ মুজিবুর রহমানসহ নেতাদের মুক্তির দাবিতে ৭ই জুন পূর্ব পাকিস্তানে পালিত হলো সর্বাত্মক ধর্মঘট। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যদের বিরুদ্ধে আনা হলো দেশদ্রোহের অভিযোগ। দায়ের করা হলো রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলা, যা সাধারণভাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মামলার বিচার শুরু হলে দানা বাঁধতে শুরু করে আইয়ুববিরোধী দুর্বার গণ-আন্দোলন।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দাবিদাওয়ার সাথে একটু কৌশল করে ছয় দফার মিশেলে এগারো দফায় রচিত হলো ছাত্রসমাজের আইয়ুববিরোধী আন্দোলন। নভেম্বর মাসে সে আন্দোলন বেশ বেগবান হয়ে উঠল। আর ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সে আন্দোলন পরিণত হলো অপ্রতিরোধ্য গণ-অভ্যুত্থানে; অবশেষে ২২শে ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলো সরকার। ২৩শে ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত গণসংবর্ধনায় পরিষদের নেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় ভূষিত করলেন।

বঙ্গবন্ধুর অপরিমেয় কৃতিত্ব এখানেই যে, 'এক ব্যক্তি এক ভোট'–এই দাবি সবচেয়ে গভীর দৃষ্টি নিয়ে মেলে ধরেছিলেন তিনি। পাকিস্তানের রাজনীতি আমূল পালটে দেওয়া ছয় দফার মূল কথা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে জনসংখ্যার অনুপাতে ছিল ১৬২টি আসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৮টি। ছয় দফার সর্বাত্মক রায় ঘোষিত হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়। বাঙালি অর্জন করল আপন ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার, শেখ মুজিবুর রহমান অর্জন করলেন গোটা জাতির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক ক্ষমতা।

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করলেও বিজয়ী দলকে সরকার গঠন করতে না দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র শুরু করলে তিনি বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন

শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উত্তাল সমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির মহান বীরপুরুষ। তিনি বীর বাঙালির প্রতীকে পরিণত হন। তিনি রাজনীতির মহান কবি, যাঁর ভাষণ শুধু আকর্ষক নয়, কাব্যিক-ব্যঞ্জনাময়ও। সম্মোহনী শক্তির অধিকারী বাংলার জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ছিল ঐন্দ্রজালিক মহাশক্তি। এই ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি স্বাধীনতার মূলমন্ত্র পাঠ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। জাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠপুরুষ বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি 'স্বাধীন বাংলাদেশ'।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের অনুরণন সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখা, সর্বোপরি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট শীর্ষক বর্বর আক্রমণের পর গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়াতেও ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। তদুপরি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং এ সরকার পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধ পেয়েছে বৈশ্বিক ও আইনগত বৈধতা। এতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় সহজতর হয়েছিল। তাই বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ পেয়েছে বৈশ্বিক স্বীকৃতি।

স্বায়ত্তশাসন দাবির ১৯৬৬-এর ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হওয়া, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, বিজয়ী দলকে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্র, অসহযোগ আন্দোলন, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা ঘোষণা, বিজয় অর্জন সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সংগ্রামী নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে অতুলনীয় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন। রাজনৈতিক নেতা ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি যতটা সম্মান অর্জন করেছেন তা বিশ্বের অনেক দেশবরেণ্য নেতাদের ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু এই কৃতিত্ব অর্জন ও সংরক্ষণ করতে গিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ক্রীড়নক কতিপয় বিশ্বাসঘাতকের তপ্ত বুলেটের সামনে পেতে দিতে হয়েছে তাঁর বিশাল বক্ষ। বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন শ্রেণির নানান শত্রু ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে এমনকি পরেও। বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কতিপয় রাজনীতিক ও সামরিক কর্মকর্তা উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করতে এবং বাংলার স্বাধীনতাকে হত্যা করার জন্য ইতিহাসের জঘন্যতম ও নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। ১৫ই আগস্টের ঘটনা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত পরিণাম। মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অস্তিত্বের শত্রুরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে প্রকারান্তরে এদেশের স্বাধীনতাকেই হত্যা করতে চেয়েছিল।

শোকাচ্ছন্ন বাঙালি এ শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। জাতির পিতাকে হত্যা করে বাংলাদেশকে পেছনের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করা হলো। তাঁর নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো নানাভাবে। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, ততই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে কিন্তু বাঙালি জাতির হৃদয়ের আসন থেকে সরাতে পারেনি। বাঙালির মানসপটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু আছেন অবিনশ্বর হয়ে; চেতনার দীপ্ত প্রতীক হিসেবে।

বিবিসি'র বাংলা সার্ভিসের পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে যে জরিপ চালানো হয়, তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে বিবেচিত হন। জননন্দিত সংগ্রামী নেতা হিসেবে তিনি অতুলনীয়। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। বাঙালি, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বাঙালির হৃদয়জুড়ে চিরঞ্জীব। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ততদিন বাঙালির হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ভাস্বর হয়ে থাকবে। মানুষের ভালোবাসায় বঙ্গবন্ধু মৃত্যুঞ্জয়। কালের চিরন্তন বেলায় তাঁর আদর্শ ও নীতি তাঁকে দিয়েছে অমরত্বের গৌরব। কেননা, বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসী বিচক্ষণ নেতৃত্বগুণ ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যেই এনেছে বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি থেকে স্বাধীনতা। এর মূলে রয়েছে তাঁর অসাধারণ দূরদর্শিতা। তিনি সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও বাঙালি জাতির পিতা। বঙ্গবন্ধু ইতিহাসে চিরভাস্বর।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা মে ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনাভাইরাসের ২য় ঢেউয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (২য় পর্যায়) উদ্‌বোধন করেন

করোনা মহামারিতে সরকারের কার্যক্রম

জুয়েল মোমিন

বিগত একুশ মাসের বেশি সময় ধরে বিশ্ব এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছে। কোভিড-১৯ নামক এক মরণঘাতী ব্যাধি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতাসম্পন্ন এই ভাইরাস একদিকে যেমন অগণিত মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষতিসাধন করছে মানুষের জীবন-জীবিকার। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এবং অর্থনীতির ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এই ভাইরাস।

দ্রুত সংক্রমিত এই ভাইরাস জনসমাগম এড়াতে না পারলে সার্বিক অবস্থার নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়বে। পুরো দেশেই সরকার মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করেছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য লকডাউনসহ নানা বিধিনিষেধও আরোপ করেছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ চলমান।

এই রোগের সংক্রমণ ঠেকাতে এবং এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ সরকার শুরু থেকেই তৎপর ছিল। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার যেমন নিয়েছে সর্বাত্মক ব্যবস্থা, তেমনি আক্রান্তদের চিকিৎসায় নিয়েছে সর্বোচ্চ উদ্যোগ। চিকিৎসা সক্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছে সরকার। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাসপাতালকে করোনাভাইরাস চিকিৎসায় সম্পৃক্ত করেছে। গত এপ্রিল মাসে মহাখালী ডিএনসিসি মার্কেটে দুই হাজার শয্যার কোভিড-১৯ হাসপাতাল স্থাপন করেছে সরকার। গত বছর মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৬ হাজার ১৬৬ জন ডাক্তার, ৫০৫৪ জন নার্স এবং প্রায় সাড়ে চার হাজার অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

জেলা হাসপাতালগুলোসহ দেশের ১৩০টি সরকারি হাসপাতালে কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে এবং করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সাধারণ মানুষ যেন মাস্ক পরে ঘরের বাইরে বের হয় এজন্য বিভিন্ন স্থানে সরকার বিনামূল্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজারও বিতরণ করছে।

কোভিড-১৯ মহামারি ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকারের করোনা টিকা বিনামূল্যে প্রত্যেক মানুষকে দেওয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সবচেয়ে কার্যকর এবং পরীক্ষিত অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা দিয়ে সরকার গণটিকা কার্যক্রম শুরু করে।

করোনার কারণে মুজিব শতবর্ষের অনুষ্ঠান আগেই সীমিত করা হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। জনগণকে বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়ার এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিদেশ ফেরতদের ১৪ দিন বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে এবং না থাকলে জরিমানার ব্যবস্থা করেছে সরকার।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সাধারণ মানুষ টিকার জন্য নিবন্ধন করে টিকা পেতে সক্ষম হয়েছে। সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিবন্ধন করে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ভ্যাকসিন সুবিধা পাচ্ছে। সুরক্ষা অ্যাপটির ওয়েব পোর্টাল হলো– www.surokkha.gov.bd।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ২১শে আগস্ট পর্যন্ত দেশে করোনার টিকা এসেছে তিন কোটি নয় লাখ ৪৩ হাজার ৭২০ ডোজ। এর মধ্যে দুই কোটি ২৪ লাখ ১৩ হাজার ৭৯ ডোজ টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকা নেওয়াদের মধ্যে প্রথম ডোজ পেয়েছেন এক কোটি ৬১ লাখ ৫৮ হাজার ৬৭৭ জন। আর দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন ৬২ লাখ ৫৪ হাজার ৪০২ জন। ইতোমধ্যে সরকারের চেষ্টায় জাপান থেকে ঢাকায় টিকার চতুর্থ চালান আনা হয়েছে। কোভ্যাক্সসহ বিভিন্ন উৎস থেকে করোনার ২১ কোটি ডোজ টিকা পাওয়ার প্রতিশ্রুতিও পেয়েছে সরকার।

শুধু তাই নয়, করোনাভাইরাস ঠেকাতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চীনের সিনোফার্মের টিকা যৌথ উৎপাদনের লক্ষ্যে ঢাকায় একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ সরকার। চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল বায়োটেক গ্রুপ অব কোম্পানিজ ও চায়না সিনোফার্ম

ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সরকার। চুক্তি অনুযায়ী চীন থেকে ভ্যাকসিন উৎপাদনের কাঁচামাল ও উপকরণ বা বাল্ক নিয়ে আসা হবে, যেটি 'সেমি-ফিনিসড' অবস্থায় থাকবে। এরপর দেশেই বোতলজাতকরণ, লেবেলিং ও ফিনিশিং করবে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস। উৎপাদনের পর সরকার চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত দামে ইনসেপ্টার কাছ থেকে ভ্যাকসিন কিনে নেবে।

করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনীতির ওপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় গত বছর সরকার চারটি মূল কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে। কার্যক্রমগুলো হচ্ছে:

১) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা: সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে 'কর্মসৃজনকেই' প্রাধান্য দেওয়া;

২) আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ প্রণয়ন: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করা, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখা;

৩) সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি: দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণ, দিনমজুর এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি;

৪) মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা: অর্থনীতির বিরূপ প্রভাব উত্তরণে মুদ্রা সরবরাহ এমনভাবে বৃদ্ধি করা যেন মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে।

এই চার মূলনীতির ভিত্তিতে সরকারের কার্যক্রম এখনো অব্যাহত রয়েছে।

জীবন ও জীবিকার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে সরকার। যারা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন তাদের সহায়তার জন্য সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত বছর করোনাভাইরাস আঘাত হানার পর থেকে চলতি মে মাস পর্যন্ত সর্বমোট এক লাখ ২৯ হাজার ৬১৩ কোটি টাকার সহায়তা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২১টি খাতে সর্বমোট এক লাখ ২১ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আর অনুদান বাবদ ৮,২৬০ কোটি টাকারও বেশি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

গত বছর সাময়িক কর্মহীন ৩৬ লাখ ৫০ হাজার মানুষকে আড়াই হাজার টাকা করে মোট নয়শো ১২ কোটি ৫০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। এ বছরও সমসংখ্যক মানুষকে একই হারে নয়শো ১২ কোটি ৫০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৬০৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। দিনমজুর, পরিবহণ শ্রমিক, সাধারণ শ্রমিক, নিম্ন আয়ের মানুষ, মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিন, অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সেবকগণ, বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক ইত্যাদি পেশার মানুষজন এই সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এসেছেন।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ দুই প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ৬৫,৬৫৪টি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছে সরকার। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩,৪৩৪টি গৃহ নির্মাণ করে ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট গৃহের সংখ্যা দাঁড়ালো ১,১৯,০৮৮টি। বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত সাড়ে তিন লাখ পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছে সরকার।

করোনাভাইরাস মহামারির সময়েও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতাধীন বিভিন্ন ভাতা, খাদ্য কর্মসূচি, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি-উপবৃত্তি প্রদানসহ সকল ধরনের সরকারি সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে সরকার। এসব কর্মসূচির সুবিধাভোগী মানুষের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি ৭৮ লক্ষ। এর মধ্যে বিভিন্ন ভাতাভোগীর সংখ্যা এক কোটি সাত লাখ, খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা দুই কোটি ১৮ লাখ এবং বৃত্তি-উপবৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা দুই কোটি ৫৩ লাখ। এছাড়া ঘরে বসে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়াশোনাসহ শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সরকার।

করোনাভাইরাসের এই মহামারির সময়ে যখন মানুষের চলাচল সীমিত হয়ে পড়ে, তখন ডিজিটাল প্রযুক্তি যোগাযোগের এবং ব্যাবসাবাণিজ্যের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই এই ক্রান্তিকালে ডিজিটাল প্রযুক্তি ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেশের ১৮ হাজার ৩৩৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও তিন হাজার ৮০০ ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

করোনাভাইরাসের সময় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। অনলাইনে ব্যাবসাবাণিজ্য এবং লেনদেন সুবিধা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু–১-এর মাধ্যমে দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সম্প্রচার ছাড়াও প্রত্যন্ত ৩১টি দ্বীপে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, চা শ্রমিক, বেদে সম্প্রদায়, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীসহ দুরারোগ্য ব্যক্তিদের চিকিৎসা খাতে সর্বমোট ছয় হাজার ৫২০ কোটি ৯০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সর্বমোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৯০ লাখ ৫০ হাজার।

সরকার এই কঠিন মহামারির সময়ে শুধুমাত্র নিজের দেশের জনগণের কথা চিন্তা করেনি। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ১১ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর সবধরনের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কক্সবাজারে বিভিন্ন ক্যাম্পে তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য ভাসানচরে এক লাখ মানুষের বসবাস উপযোগী উন্নতমানের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। স্বইচ্ছায় যেতে ইচ্ছুক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাঠানো হচ্ছে ভাসানচরে।

আইনের শাসন সমুন্নত রেখে মানুষের নাগরিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে যা যা প্রয়োজন সেই সকল কার্যক্রম করে যাচ্ছে সরকার।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আদর্শকে ধারণ করে সরকার জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক কল্যাণকামী সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। করোনাভাইরাসের এই অমানিশা দ্রুত কেটে যাক এবং বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত হোক– এটাই হোক নতুন দিনের প্রত্যাশা।

লেখক : প্রাবন্ধিক

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের পায়রাগুলো

জসীম আল ফাহিম

সকালবেলা খোপের ভেতর পোষা পায়রাগুলো অধীর হয়ে ডাকাডাকি করতে থাকে। কবুতরের এরূপ ডাকাডাকিতে বঙ্গবন্ধুর হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। এত সকালে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তাঁর মনে কোনোরূপ বিরক্তির সঞ্চার হয়নি। বরং তিনি কান পেতে কৌতূহলী মনে পায়রাদের গান শুনতে থাকেন। পায়রাগুলো একটানা ডেকেই চলেছে– বাকবাকুম। বাকবাকুম। বাকবাকুম। ওদের কণ্ঠ কেমন যেন বিষাদমাখা। বঙ্গবন্ধু মনে মনে ভাবেন, আজ ওদের কী হয়েছে! ওরা এমন করুণ সুরে গান করছে কেন?

বঙ্গবন্ধু আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেননি। বিছানা থেকে উঠে ধীর পায়ে এসে তিনি দোর খোলেন। অমনি একপশলা ভোরের আলো তাঁর চোখেমুখে আশ্চর্য স্বর্গীয় দ্যুতি ছড়িয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধুর পরনে সাধারণ লুঙ্গি। গায়ে স্যান্ডু গেঞ্জি। ভোরের হিমেল বাতাস যেন তাঁর শরীরে মৃদু পরশ বুলিয়ে কিছু একটা পুলক সঞ্চার করতে চাইছে। সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। তিনি অবাক মনে ভাবেন– পায়রাগুলোর আজ কী হয়েছে! এমন করে ওরা ডাকছে কেন! ভেবে তিনি আর দেরি করেননি। তড়িঘড়ি করে গিয়ে খোপের দরজা খুলে দেন।

অমনি পায়রাগুলো হুড়োহুড়ি করে পাখা ঝাপটিয়ে যে যার মতো খোপ থেকে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আর কোনো কথা নেই, তাঁর মাথার ওপর দিয়ে ওরা ঝাঁকবেঁধে নীল আকাশে উড়াউড়ি শুরু করে দেয়। বঙ্গবন্ধু অবাক চোখে পায়রাগুলোর নয়ন ভোলানো উড়াউড়ি দেখতে থাকেন। কিছু সময় উড়াউড়ি করে পায়রাগুলো শান্ত হয়ে যায়। উঠোনের গাছপালা এবং বাড়ির ছাদে গিয়ে ওরা স্থির হয়ে বসে। ওদের কয়েকটি আবার বঙ্গবন্ধুর কাঁধে এবং হাতে এসে বসে। তিনি পায়রাগুলোকে হাতের আলতো পরশ বুলিয়ে আদর করেন। আর মনে মনে বলেন, আহা রে অবোধ বোবা পাখি! না জানি তোদের মনে কী কষ্ট জমা হয়েছে!

সেসময় ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল। দুহাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে বাবার পাশে এসে দাঁড়ায়। সূর্য তখন উঠে গেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ঘুঘু পাখির করুণ গান। প্রাচীরের ওপর বসে দুটো ভোরের দোয়েল পাখি আপনমনে শিস দিয়ে যায়। ওদের কণ্ঠেও আজ কোনোরূপ মধু ঝরছে না। কণ্ঠ কেমন যেন সকরুণ। শেখ রাসেলের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে সে পায়রাগুলোর উড়াউড়ি খেলা দেখতে থাকে।

এক ফাঁকে বঙ্গবন্ধু কাকে যেন উদ্দেশ করে বলেন, 'এই কে আছো। পায়রাগুলোর জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসো।'

অমনি গৃহকর্মী আবদুল একটা পাত্রে করে কিছু শস্যদানা দিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু গভীর মনোযোগ সহকারে উঠোনে শস্যদানা ছিটিয়ে প্রিয় পায়রাগুলোকে খাওয়াতে থাকেন। পাশে দাঁড়িয়ে শেখ রাসেল বাবার পায়রা পালন দেখতে থাকে। পায়রাগুলো শস্যদানা খায় আর বাকবাকুম বাকবাকুম ডাকতে থাকে। ছোট্ট শেখ রাসেল মনে মনে ভাবে– বাবা তো দেখছি শুধু মানুষেরই রাজা নয়। এই দেশে যত পাখপাখালি আছে, বাবা সকলেরই রাজা।

সকালবেলা নাশতা করতে বসেন বঙ্গবন্ধু। শেখ রাসেলও বাবার সাথে খেতে বসে। শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং তাঁদের বধূরাও একসঙ্গে নাশতা করতে বসেন। পাশে বসে বঙ্গমাতা নিজ হাতে

সকলের পাতে খাবার তুলে দেন। সেসময় পোষা বিড়ালটা লুকিয়ে এসে একবার বঙ্গবন্ধুর শরীর ঘেঁষে যায়। বিড়ালটা কী মনে করে যেন একবার ম্যাও করে ডেকে ওঠে! সে বড়ো করুণ সুরের ডাক। বঙ্গবন্ধুর দরদি মন হঠাৎ হো হো করে ওঠে। তিনি টেবিলের কোণায় বিড়ালটার জন্য কিছু খাবার রাখেন। বিড়ালটা লাফ দিয়ে টেবিলের উপর উঠে বসে। কিন্তু খাবারে মুখ দেয় না। বরং আবারও সে করুণ সুরে ডেকে ওঠে। বঙ্গমাতা বিড়ালটাকে তাড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু পারেন না। বঙ্গবন্ধু বাধা দেন। বলেন, 'থাক না। অবোধ বোবা প্রাণী!'

কিন্তু বিড়ালটা খাবারও খায় না, চলেও যায় না। বরং আবারও সে করুণভাবে ডেকে ওঠে। বিড়ালটার এমন করুণ ডাক যেন বঙ্গবন্ধুর মনে কান্না হয়ে বাজে। খাওয়া সেরে তিনি তোয়ালে দিয়ে হাতমুখ মোছেন। আর গভীর ভাবনায় তলিয়ে যান। তিনি অনুভব করেন কিছু একটা অশুভ যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাঁর পরিবারকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বঙ্গমাতার সাথে তিনি সবকিছুই শেয়ার করেন। কিন্তু আজ যেন তাঁর কী হলো। কেমন যেন ঘোরের ভেতর দিয়ে তিনি সময় পার করছেন। কিন্তু ঘোরটা যে কী তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। তবে মনে হচ্ছে চারপাশে প্রকৃতি কেমন যেন গুমরে কাঁদছে। কেমন যেন হাহাকার করে উঠছে। প্রকৃতির হাহাকারের যে কী হেতু, বঙ্গবন্ধু ঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না।

সেসময় অফিসের গাড়ি এসে গেটের সামনে দাঁড়ায়। কালো রঙের গাড়ি। গাড়িটা দেখে হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর বুকের ভেতরটা কেমন যেন একবার ধক করে ওঠে। মনে মনে ভাবেন– আজ কেন আমার ভাগ্যে এই কালো রঙের গাড়িটাই জুটল! সকাল থেকেই তাঁর মনটা কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে আছে। গাড়ির কালো রংটা মনের বিষণ্নতা আরও বাড়িয়ে দিলো। আজ কালো রংটাকে তিনি কেন জানি মানতে পারছেন না। কিন্তু একথা তিনি মুখ ফুটে কাউকে বলতেও পারছেন না। পরে বিষণ্ন মনেই তিনি কালো রঙের গাড়িতে চড়ে অফিসে যান।

সন্ধ্যার পর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে খোন্দকার মোশতাক আসে। মোশতাক বঙ্গবন্ধুকে ভাতৃজ্ঞান করে। বঙ্গবন্ধুও তাকে কাছের মানুষ ভাবেন। খোন্দকার মোশতাক একটা পাত্রে করে বঙ্গবন্ধুর জন্য রান্না করা হাঁসের গোশত নিয়ে এসেছে। হাঁসের গোশত যে বঙ্গবন্ধুর খুবই প্রিয়, একথা তার ভালোই জানা। সে রাতে হাঁসের গোশত দিয়ে বঙ্গবন্ধু ডিনার সারেন। পরে দুজন মিলে কিছু সময় গল্প করেন। মোশতাক চলে যাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু কিছু সময় আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকেন।

মাঝরাতে বঙ্গবন্ধু হঠাৎ কুকুরের ঘেউঘেউ শুনতে পান। দূর থেকে ভেসে আসছে অশনি সংকেতবাহী কুকুরের ঘেউঘেউ কান্না। এতরাতে কুকুরের ঘেউঘেউ করার হেতু বঙ্গবন্ধু ঠিক বুঝতে পারছেন না। তাই তিনি পাশ ফিরে শুলেন। কিছুসময় পর আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের ঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখেন, কোনো দূর অচিনপুরে যেন তিনি চলে গেছেন। যেখানে শুধু যাওয়ারই পথ খোলা। কিন্তু ফেরার পথ নেই। স্বপ্ন দেখার পরক্ষণে হঠাৎ বঙ্গবন্ধুর ঘুম ভেঙে যায়। সেসময় তিনি এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ শুনতে পান। তাঁর স্বজন ও মন্ত্রিসভার সদস্য আবদুর রব সেরনিয়াবাত আর নেই। উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে তিনি নিচতলায় ব্যক্তিগত সহকারী মহিতুলকে টেলিফোন করেন। বলেন, 'সেরনিয়াবাতের বাসায় দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ করেছে। জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন লাগাও।'

ততক্ষণে ধানমন্ডির তাঁর বাড়িটাও আক্রান্ত হয়ে গেছে। বাইরে মুহুর্মুহু গুলি বর্ষণ চলছে। মহিতুল কয়েক জায়গায় ফোন করে। কিন্তু কোনো সাড়া মিলেনি। একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধু নিজেই রিসিভার তুলে নেন। দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি...।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর কথা শেষ করতেও পারেননি। জালানার কাঁচ ভেঙে একঝাঁক বুলেট এসে দেয়ালে লাগে। কাঁচের একটা টুকরো এসে মহিতুলের ডান হাতের কনুই জখম করে। জানালা দিয়ে অবিরাম গুলি আসা থামেনি। এরই মধ্যে বঙ্গমাতা, গৃহকর্মী আবদুলকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর পাঞ্জাবি ও চশমা পাঠান। বঙ্গবন্ধু পাঞ্জাবিটা পরে নেন। চশমা চোখে দেন। সেসময় কোনো এক অজানা কারণে হঠাৎ গুলিবর্ষণ থেমে যায়। বারান্দায় বেরিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রহরারত সেনা ও পুলিশ সদস্যদের জিজ্ঞেস করেন, 'এত গুলি হচ্ছে, তোমরা কী করছ?'

কিন্তু কোনো উত্তর মিলে না।

বারান্দা থেকে রুমে ফিরে যান বঙ্গবন্ধু। এবার তিনি সামরিক সচিব কর্নেল জামিল উদ্দিনকে ফোন করেন। বলেন, 'জামিল তুমি তাড়াতাড়ি এসো। আর্মির লোকেরা আমার বাসা অ্যাটাক করেছে। সফিউল্লাহকে ফোর্স পাঠাতে বলো।'

একটুক্ষণ পর নিজেই সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহকে ফোন করেন। তিনি বলেন, 'সফিউল্লাহ! তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে। কামালকে বোধ হয় মেরেই ফেলেছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও।'

জেনারেল তখন সামরিক ভাষায় বলে, 'আই অ্যাম ডুয়িং সামথিং। ক্যান ইউ গেট আউট অব দ্য হাউস?'

আর কিছু শোনা যায় না। শুধুই গুলির আওয়াজ। একপর্যায়ে ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে ফেলে। মৃত্যুর সামনেও বঙ্গবন্ধুর সাহসী উচ্চারণ– 'এই তোরা কী চাস? কোথায় নিয়ে যাবি আমাকে?'

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের কাছে ঘাতক মহিউদ্দিন ঘাবড়ে যায়। বঙ্গবন্ধু আবারও হুংকার ছেড়ে বলেন, 'তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি? কী করবি? আমার সঙ্গে বেয়াদবি করছিস কেন?'

সেসময় ধানমন্ডির বাড়িটির নিচতলা ও দোতলার সিঁড়ির মাঝামাঝিতে অবস্থান নেয় ঘাতক বজলুল হুদা ও নূর। অস্ত্র তাক করে বঙ্গবন্ধুকে নিচে নামিয়ে আনার সময় ঘাতক মহিউদ্দিনকে উদ্দেশ করে নূর কিছু একটা বলে। নূরের কথা শুনে মহিউদ্দিন সতর্ক হয়ে যায়। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে সরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘাতক বজলুল হুদা ও নূরের হাতের স্টেনগান দুটো গর্জে ওঠে। সেই সঙ্গে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়ে সিঁড়ির মাঝখানে পড়ে থাকেন। পিতার পবিত্র রক্তে সারা সিঁড়ি ভেসে যায়। সে রাতে ঘাতকদের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হন আরও ১৭ জন নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ।

সেদিনও যথানিয়মে ভোর হয়। মেঘাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ ভোর। ফুল ফোটে। গন্ধহীন, বিবর্ণ ফুল। দূর বনে হয়ত স্মৃতিকাতর পাখিরাও মনের ভোলে গান গেয়ে ওঠে। সে বড়ো করুণ সুরের গান। শুধু ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ির পায়রাগুলো আকাশে উড়া ভুলে গিয়ে চিরদিনের মতো গম্ভীর হয়ে থাকে।

বত্রিশ নম্বর

কামাল চৌধুরী

এই বাড়িটা জাতির পিতার, এই বাড়িটা সবার
এই বাড়িটা মুজিব নামে পলাশ, রক্তজবার
এই বাড়িটা অশ্রুলেখা শোকের আগস্ট মাস
এই বাড়িটা পিতৃভূমির কান্না, দীর্ঘশ্বাস।

এই বাড়িটা পদ্মা-মেঘনা, মধুমতীর জল
এই বাড়িতে চিরকালের সাহস অবিচল
মুক্তিদাতা উন্নত শির–দীর্ঘদেহী ভোর
এই বাড়িটা অন্ধকারে তাড়ায় ঘুমঘোর।

এই বাড়িটা একাত্তরে মুক্ত নীলাকাশ
হত্যাকারী, শত্রুসেনা, রাজাকারের ত্রাস
এই বাড়িটা সাহস দিলে আমরা জেগে থাকি
বাংলা মায়ের রক্তশপথ হাত উঁচিয়ে রাখি।

এই বাড়িটা হাজার বছর পলিমাটির ক্রোধে
লাল-সবুজে মহিমাময় আত্মত্যাগী রোদে
এই বাড়িটা ধুলো-কাদা, বৃষ্টিভেজা মাটি
মহাকালের বটের ছায়ায় আমরা সবাই হাঁটি।

এই বাড়িতে মুজিব আছেন, জাতির বাতিঘর
রবি ঠাকুর, নজরুল তাঁর প্রাণের কণ্ঠস্বর
এই বাড়িতে পাল উড়িয়ে মহামানব আসে
জয়বাংলার স্রোতের মুখে নৌকোখানি ভাসে।

তর্জনীতে আকাশ কাঁপে, তর্জনীতে দেশ
এই বাড়িটা বজ্রকণ্ঠ–মুক্তি অনিঃশেষ
এই বাড়িটা স্বাধীনতা, রক্ত দিয়ে লেখা
এই বাড়িতে বিশ্বজনের মহাসাগর দেখা।

এই বাড়িটা স্মৃতিসত্তা, জাতির জাদুঘর
এই বাড়িতে জাতির পিতা, আছেন মুজিবর
এই বাড়িটা তোমার আমার আত্মপরিচয়
এই বাড়িটা বঙ্গবন্ধু, জাতির হিমালয়।

আমার কবল থেকে পালাতে চাই

অতনু তিয়াস

একটা গ্রহভর্তি মানুষের ভিড় থেকে হাত তুললাম– আমি খুনি
আমার নামে কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নেই
একদিন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার সুযোগ হলে
আমারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবো–
আহত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সত্তাকে হত্যা করেছি!
কারাগার থেকে নয়, ফাঁসির মঞ্চ থেকে নয়
আমার কবল থেকে পালাতে চাই!

মুজিব মানে আঁধার ভাঙা গান

সোহরাব পাশা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
চেতনার বাতিঘর তিনি দীপ্ত সূর্যের সমান

নীল আকাশে লাল-সবুজের ওই পতাকা
বঙ্গবন্ধুর প্রাণের গহিন স্বপ্ন-আঁকা

এ মাটির যেখানেই ছোঁবে মুজিব উঠবে হেসে
অকাতরে দিয়েছেন প্রাণ এদেশকে ভালোবেসে

মুজিব মানে আঁধার ভেঙে জেগে ওঠা দৃপ্তপ্রাণ
মুজিব মানে বাংলাদেশ, স্বাধীনতার জয়গান

মুজিব মানে বাঙালির মুখ বাঙালির সুখ
মুজিব মানে বাঁধনছেঁড়া ইস্পাতকঠিন বুক

মুজিব তুমি বাঙালির তুমি তো বাংলার
মৃত্যু নেই তোমার, ফিরে আসবে তুমি বার বার

হে মুজিব, মৃত্যু তোমাকে করেনি নিঃশেষ
তুমি আছো প্রাণে প্রাণে যতদিন আছে বাংলাদেশ।

তোমারই থাকবো

মো. আফরাজুর রহমান

আমি তোমারই আছি
তোমারই থাকবো
আজীবন শুধু তোমাকে নিয়েই ভাববো;
তোমাকে নিয়েই কাব্যগাথা করবো।

আমি তোমারই আছি
তোমারই থাকবো
রংতুলিতে শুধু তোমাকে নিয়েই
রঙিন ছবি আঁকবো।
আমার আকাশে শুধু তোমার ঘুড়িই উড়বে
এ হৃদয়ে তুমিই শুধু ফুল হয়ে ফুটবে।

আমি তোমারই আছি
তোমারই থাকবো
তোমাকে নিয়েই হাজারো স্বপ্নের জাল বুনবো
বার বার শুধু তোমার কাছেই ফিরে আসবো।
এ দেহ মন হৃদয় দিয়ে
তোমাকেই শুধু ভালোবাসবো।

আমি তোমারই আছি
তোমারই থাকবো।

সেই কাহিনি জানতে হবে

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

এই যে স্বাধীন বাংলাদেশে তুমি-আমি বাস করি
বাংলা ভাষার শব্দ দিয়ে গান-কবিতা চাষ করি–
সেই বাঙালি ভুগলো কত গ্লানি–
ইতিহাস কি আমরা পুরো জানি?

জানতে হবে মানতে হবে ইতিহাসের ধারা
এই বাঙালির শত্রু ছিল কারা
চিনতে হবে সেসব হতচ্ছাড়া।

এই জাতিকে অত্যাচার করতে গিয়ে খতম
বাহান্নতে ভাষার ওপর করল আঘাত প্রথম
সেই আঘাতের জবাব দিতে
ঢাকা শহর রাজধানীতে
মিছিল বেরোয়, উঠল প্রবল ঝড়
সেই মিছিলে গুলি চালায় পাষণ্ড বর্বর।
গুলি খেয়ে ঝরল কত প্রাণ–
সেদিন থেকে পর হয়ে যায় আজব পাকিস্তান।

তারপরে এক মহান পুরুষ শেখ মুজিবুর নাম
দুরন্ত উদ্দাম
ছয়টি দফার দাবি তুলে
দিলেন সবার চক্ষু খুলে
সেই দাবিতে এক কাতারে হয় মিলিত সবে
বঞ্চিতদের সব অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

জেলে গেলেন, তবু মুজিব হননি নতশির
ততদিনে দ্বিগুণ সাহস বাড়লো বাঙালির
দুঃশাসকের প্রাণ দলনে
অসহযোগ আন্দোলনে
যুক্ত হলো দেশ
সৃষ্টি হলো অগ্নিগিরির তপ্ত পরিবেশ।

বেরিয়ে এলেন নেতা
প্রবল স্বাধীনচেতা
তাঁরই ডাকে যুদ্ধ হলো, ঝরল লাখো প্রাণ
সেই রক্তে দাফন সেরে তাড়াই পাকিস্তান।

সেই কাহিনি জানতে হবে আগে
মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলো কার না ভালো লাগে।

জাতির জনক

সত্যজিৎ বিশ্বাস

বিশ্ব আজ দুইভাগে ভাগ– শোষক আর শোষিত,
চিরসত্য বাণীটি মহান জাতির জনক ঘোষিত।
শোষিতের পক্ষে দীপ্তকণ্ঠে তর্জনী উঁচু করে,
আপোশ করে নোয়ায়নি মাথা, আজীবন গেছে লড়ে।

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম– উদাত্ত কণ্ঠস্বর,
লাখো বাঙালির চিত্তে সেদিন তুলে দিয়েছিল ঝড়।
কয়েক মুহূর্তের একটি ভাষণে বাঙালি তোলপাড়
নিরস্ত্র জাতি সশস্ত্র হয়, মানেনি কখনো হার।

স্বাধীন দেশের পতাকা নিয়ে গর্বে যখন দেশ,
জাতির পিতাকে কুচক্রীরা সপরিবার করে শেষ।
পনেরোই আগস্ট বাঙালি জাতির গভীর শোকের দিন,
জাতির জনক সূর্যসন্তানের কাছে গোটা জাতির ঋণ।

শোকের মাস

চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

আগস্ট মাসের ঠিক পনেরো
খুন হয়েছে রাতে
কুলাঙ্গারের বাচ্চারা সব
হত্যাযজ্ঞে মাতে।

খুন হয়েছে জাতির পিতা
বেগম মুজিব সেও,
কামাল জামাল শিশু রাসেল
বাদ যায়নি কেও।

পুত্রবধূ নাসের মণি
খুন হয়েছে কতো,
নির্বিচারে চালায় গুলি
যেন পশুর মতো।

যাঁর জন্য লাল-সবুজের
দেশটা পেলাম ফিরে,
যাঁর ছবিটা বুকের মাঝে
আজও আছে ঘিরে।

সেই নেতাকে খুন করাতে
শূন্য হলো দেশ,
গণতন্ত্রের স্বপ্নগুলো
সবই হলো শেষ।

তাঁর কন্যা করলো বিচার
খুনির দিলো ফাঁসি,
জনকহারা এই বাঙালির
ফুটলো মুখে হাসি।

দূরদর্শী চশমা

প্রণব মজুমদার

বাবাকে দেখেছি কী যেন চোখে রেখে পড়ছেন বই
বাল্যবেলায় ঘরে দেখা সে দৃশ্যে অতটা পরিচিত নই!
চোখে আবরণ কখনও সুতোয় বাঁধা তাঁর সে জিনিসে
পাঠে মনোযোগ কী যেন ভাবেন তিনি এক নিমিষে।
দিনে দিনে বাড়ে বয়স, শিশুকাল ছেড়ে কৈশোরে পা
পত্রিকার পাতায় ছবি দেখিয়ে একদিন বলেন বাবা–
'এই দেখ আদর্শ নেতার ছবিটা, কী মায়াময় চোখ!'
বাবার মতো দৃষ্টি আবরণ তাঁরও, মুখে আছে রোখ।
চশমা নাকি একে বলে, সাদামাটা, রং তার কালো
বঙ্গবন্ধু মানুষটি ভূষণে সাধারণ, মন তাঁর ভালো।
সেই থেকে পিতাদের দুচোখের আবরণ নামটা জানি
দেশপ্রেমিক নেতা শেখ মুজিবুরকে সবাই বন্ধু মানি।
প্রজ্ঞাময় চশমায় খুঁজে পায় লাল-সবুজের এই দেশ
অমর নেতার দূরদর্শী চশমার স্বপ্নপূরণ হচ্ছে বেশ!

ঘাতক

সিরাজউদ্দিন আহমেদ

কে তুই ঘাতক ভয়াল দর্শন মূর্খ মূঢ়
আমার বক্ষদেশে রেখেছিস ঘৃণিত পদাঘাত
সীমারের মতো উঁচিয়েছিস তীক্ষ্ণধার খঞ্জর
আমি মোটেও শঙ্কিত নই
চেয়ে দ্যাখ আমার দুচোখে নেই মৃত্যুভয়
জেগে আছে প্রিয়তমার স্বপ্নের কারুকাজ
যা বিদীর্ণ করা তোর সাধ্য নয়
হা হা আমি তোর মৃত্যুকে দেখাতে পারি বৃদ্ধাঙুল
তোর প্রতিটি ভয়ংকর আঘাত
বিমূঢ়ের মতো ফিরে যাবে
কেননা হোসেনের মতো তুই পাবিনে কোথাও
প্রিয়তমার চুম্বনহীন কেশাগ্র শরীর
যেখানে স্পর্শ করতে পারে তোর তীক্ষ্ণধার খঞ্জর!

মেঘঃ বৃষ্টিঃ জল

জাফরুল আহসান

পথের পাশে গাছগাছালি স্বর্ণলতা
পাহাড় ঘেঁষে গহীন কালো মেঘের ছাতা
বউ-টবানি ঝিলের জলে নাইতে নামা
জলের কণা ভাঙলো বুঝি নির্জনতা!

মেঘ-বৃষ্টি মায়া-কান্না ভাল্লাগে না
চোখের কোণে মিহিদানার জলের কণা
জলকেলিতে ভাসিয়ে দিল এই দীনতা
সাঁঝবেলাতে বলব তারে মনের মিতা?

মেঘ পাহাড় বৃষ্টি হয়ে জলের কণা
রাখল ধরে আমার শত দেনা-পাওনা।

ভোর

আনসার আনন্দ

অনিঃশেষ আমাকে খুন করি আমি
প্রতিদিন সময় গিলে খাই সময়ে

ভুল করে করে ভুলের মিনার গড়ি
নিহত বিবেক জন্ম দেয় পশুজাত
পৃথিবী ডুবে যায় অন্ধকার অতলে।

চারদিকে পাপের আঁধার কান্না চোখ
দিগন্তে উড়ে যায় শান্তি নামের পাখি
আনন্দ নেই আজ মনের ঠিকানায়–

যখন ফেরে না সময় দ্বিতীয় জন্মে
জীবন খাতায় থাকে না কোনো আগামী
এখনি এসো দুহাতে কুড়াই ফসল
এভাবে সময়ে দেখ ঐ সোনালি ভোর।

মুজিব বিরহে

মো. মোস্তাফিজুর রহমান

মুজিব তুমি বিশ্বনেতা
বাংলাদেশের প্রাণ,
জীবনবাজি রেখে তুমি
রাখলে দেশের মান।

বিশ্বাসঘাতক নরপশুরা
দেশের চিরশত্রু,
তোমায় তারা করল শহিদ
ঝরলো জাতির অশ্রু।

পিতৃহারা দেশের হাল যে
ধরার ছিল না কেহ,
দুশমনেরা চিবিয়ে খেয়েছে
বঙ্গভূমির দেহ।

তোমার গড়া সোনার বাংলা
বিরহে সদা কাঁদে,
বেইমানদের রুখতে আজও
যুদ্ধ দামামা বাধে।

বঙ্গবন্ধুর স্পর্শে খুঁজে পাই দেশপ্রেম

আতিক আজিজ

বঙ্গবন্ধু, তোমার যৌবনদীপ্ত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কণ্ঠস্বর
সাহস বুদ্ধি সাতই মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণায়
বিশ্বের মানচিত্রে তেজোদীপ্ত লাল-সবুজের পতাকা উড়ে,
অথচ রক্তপিপাসু পাকিস্তানি অনুসারী শকুনরা
বাংলার ডাকঘর বত্রিশ নম্বরে চালালো বুলেট,
ক্ষতবিক্ষত হলো ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল
ইতিহাসের পাতায় পনেরোই আগস্ট স্থান পেলো
নৃশংস কলঙ্কময় এক অধ্যায়।
বঙ্গবন্ধু তুমি নেই অথচ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার
স্বপ্নদ্রষ্টা যে তোমার কন্যা শেখ হাসিনা,
যুদ্ধাপরাধীর বিচারে কতটুকু আপোশহীন তা বিশ্ববাসী দেখে হতবাক!
তোমার কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে
পনেরোই আগস্ট নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার বিলম্বে হলেও
কিছুটা অভিশাপমুক্ত হলো রক্তস্নাত বাংলার মাটি।
বঙ্গবন্ধু, তোমার শ্রেষ্ঠ ভাষণে রক্তিম আভা
ছড়িয়ে পড়ছে নদী আর সূর্যের মিলনে।
পনেরোই আগস্ট রক্তস্নাত হয়ে ফুটে আছে পলাশ আর শিমুল,
দেশপ্রেমিক প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে তোমার ছবি হাসে।
বঙ্গবন্ধু, তোমার সংস্পর্শে খুঁজে পাই দেশপ্রেমের দারুণ উৎসাহ,
আমার কোনো সঙ্গী নেই–
বঙ্গবন্ধু, তোমার ছায়ার মধ্যেই আমার শরীর,
তাই বারুদ জ্বালাতে চায় দ্রোহের আগুন।
বঙ্গবন্ধু তুমি নেই–
তবুও পটে আঁকা তোমার ছবি ভালোলাগায় ভরপুর।

পাখিটির শোকগাথা

রোকেয়া ইসলাম

লেকের পাড়ের গাছটিতে ঠায় বসে থাকে
একটি সবুজ পাখি
পাখির ঠোঁট শুধু নীরব কান্না
ধানমন্ডির লেকে বয়ে চলে শতাব্দীর জল
পাড়জুড়ে নধর সবুজ গালিচা
গাছে গাছে পত্রপল্লবের মেলা
বত্রিশের এপাড়ে এলে আমার সমস্ত সত্তায় তিনি
তাঁর তীব্র সংগ্রামের উল্লাস
তবুও পাখিটা আর ডাকে না।
আগস্ট মানেই অগ্নিঝরা ক্রন্দন
আকাশ উপচানো শোক
ঝরে পড়া পাতায় পাতায় বিলাপ
আগস্ট মানেই পাখির কালো চোখে অশ্রু
আগস্ট এলে বলতে চাই পাখিটির কথা
পাখিটি ম্লান বসে থাকে
পাখির বুকে আঁকা বঙ্গবন্ধুর নিহত রাত
পাখির বুকে বাংলাদেশের শোকগাথা।
পাখিটি ঠায় বসে থাকে বত্রিশ নম্বরের
একটি গাছে ...।

পিতা তুমি সাহস জোগাও

ইমরান পরশ

বাংলাদেশের আকাশ বাতাস
তোমার কথা বলে
বাংলাদেশের সাগর নদী
তোমার নামে চলে।
তুমি ছাড়া ভাল্লাগে না
এই বাংলায় থাকা
তোমার ছবি বাংলাদেশের
প্রতি কণায় আঁকা।
পিতা তুমি– জনক তুমি
বীর বাঙালির বুকে
পিতা তুমি সাহস জোগাও
দুঃখ এবং সুখে।

সবুজ মাঠ

বোরহান মাসুদ

সবুজ মাঠে রক্তঝরায় লাল হয়েছে লাল
রক্তঝরার দিনগুলো ঐ পশ্চিমাদের চাল।
পশ্চিমারা হঠাৎ করে বাংলায় দিলো ঝাঁপ
আমার মায়ের রক্ত খেয়ে করছে ভীষণ পাপ।
তার প্রতিবাদ করতে কত জীবন দিলো ভাই
সারা জীবন আমরা তাঁদের স্মরণ করে যাই।
ইতিহাসের পাতায় তাঁদের লেখা আছে নাম
বলছে তাঁরা : 'রক্ত দিলাম চাই না যে তার দাম।
আবার যদি জন্ম হওয়ার সুযোগ যদি পাই
দেশের জন্য জীবন দিলে ধন্য হবো ভাই।'

আমাদের ভালোবাসা

শামছুন নাহার

আমাদের ভালোবাসায়
কোনো নির্মাণ নেই।

ঘরছাড়া পথিকের যেমন ঘর থাকে না
থাকে না কোনো পিছুটান,
আমাদের ভালোবাসাও তেমনি জানে না বন্ধন
মোহজালের রঙিন ফানুস উড়াতে।

আমাদের ভালোবাসায় কোনো ঋণ নেই
কেবলি ভালোলাগার আধিক্যে
উথালপাথাল ভাঙে বুকের নীরবতা।

আমাদের ভালোবাসা সন্ন্যাসী সাহসে
দারুণ স্বাভাবিক।
জাগতিক যত অসহ্য ক্ষুধা-তৃষ্ণার আগুন বধ করে
অলৌকিক দাহ শেষে
শুধুই সুন্দরের বিনির্মাণ।

বিদ্রোহী নজরুল

এম ইব্রাহীম মিজি

সাম্যবাদীর কবি তুমি
ন্যায়ের কণ্ঠস্বর,
নতুন আলোর দীপ্ত শিখায়
তিমির করো ভোর।

স্বদেশপ্রেমের চিত্র আঁকা
তোমার সব লেখায়,
সেই লেখাতে পথহারাকে
আলোর পথ দেখায়।

নির্যাতিত আর নিপীড়িত
ভাগ্যহত যারা,
ভুখা নাঙ্গা পথের মানুষ
জাগে সর্বহারা।

আসানসোলের দুখু মিয়া
বিদ্রোহী নজরুল,
গর্ব তুমি বিশ্ববাসীর
বাংলার বুলবুল।

বঙ্গবন্ধুকে দেখি যখন

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

বঙ্গবন্ধুকে দেখি যখন বাংলাটাকে দেখি তখন
সোনার বাংলা রূপে
যে ইচ্ছেটা বঙ্গবন্ধুর বুকে ছিল চুপে।
বঙ্গবন্ধুকে দেখি যখন মুক্ত আকাশ দেখি তখন
উড়ছে কত পাখি
ওরা যেন স্বাধীন সুখে করছে ডাকাডাকি।
বঙ্গবন্ধুকে দেখি যখন রেসকোর্সের মাঠ দেখি তখন
চোখের সামনে ভাসে
ভাষণ শুনে লক্ষ মানুষ স্বাধীন সুখে হাসে।
বঙ্গবন্ধুকে দেখি যখন ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে তখন
বলছে আমায় ডেকে
দেশটা রাখো মনের মাঝে স্বপ্ন দিয়ে এঁকে।
বঙ্গবন্ধুকে দেখি যখন প্রেরণার সুখ পাই তখন
এই বাংলার বুকে
তাঁর ত্যাগের এই বিনিময়ে আমরা আছি সুখে।
বঙ্গবন্ধুকে দেখি যখন প্রশ্ন মনে জাগে তখন
কোন সে হায়েনার দল
দেশপ্রেমী এই মানুষটাকে ক্যামনে মারলি বল্।
বঙ্গবন্ধুকে দেখি যখন লাল সালাম জানাই তখন
হয় না বলে শেষ
তাঁর চেহারায় ভেসে ওঠে স্বাধীন বাংলাদেশ।

ঠিকানা বাংলাদেশ

সেহাঙ্গল বিপ্লব

প্রখর দুপুর বাজছে নূপুর রিনিঝিনি পায়ে তার
একলা আমার মন বেসামাল শ্যামলিমা গাঁও যার
তার সে চলনে হঠাৎ তোমাকে মনে পড়ে যায় খুব
এমন গরমে পুকুরের জলে মন দিতে চায় ডুব।
হাজারো দুয়ারে ঘুরে ঘুরে শেষে এসেছি তোমার নীড়ে
কোথাও পাইনি বিনয় এমন অসংখ্য লোক ভিড়ে
নূপুরের ধ্বনি কী করে এমন মিষ্টি মধুর হয়?
শুধু সে মামুলি গ্রাম্য বালিকা আধুনিকা কেউ নয়!
তবু সে বালিকা চলনে-বলনে আমাকে মানায় হার
রূপে-গুণে জুড়ি নেই কোনো ব্যবহারে পাই তার।
নূপুর যে তার রূপক মাত্র ছন্দে সে পথ হাঁটে
কত যে হৃদয় কুপোকাত হলো গুণী রূপসির ঘাটে।
বাঁকা ঠোঁটে হাসি দেখে মনে হলো যে অপূর্ব মোনালিসা
চোখের চাহনি হরিণীর যেন বনলতা পাবে দিশা?
সবুজ কপালে টিপের আসন আঁকা রক্তিম লালে
এমন রূপসি কোথাও দেখেছ পৃথিবীর কোনোকালে?
একটি পলক দেখলেও তাকে যুগে যুগে থাকে রেশ
মেয়েটি যে এই শ্যামল গাঁয়ের– ঠিকানা বাংলাদেশ!

নিস্তব্ধ রজনি

সুজিত হালদার

নিস্তব্ধ রজনির শোকাহত রাত
শ্রাবণের ধারা ঝরে আজও
সেও তো রক্তের ধারাপাত।
স্বপ্নরা উড়ে গেছে দূর নীলিমায়
বাংলার মাটি বলে মুজিব
আয় ফিরে আয়!
প্রবহমান রক্তের স্রোতধারা
ডুবে থাকা নিশি তারা
কেঁদে কেঁদে ডেকে বলে মুজিব
আয় ফিরে আয়!
হায়! অভাগা জাতি–
যে কথা বুঝে শ্রাবণও ধারায়
তোমরা বোঝনি খ্যাতি।
শোকাভিভূত বাঙালির বুকে
কান্না ঝরা শ্রাবণ শোকে–
মুজিব ঘুমায় এ-ই বাংলায়।

শোকের আর এক কারবালা

আবীর আহম্মদ উল্যাহ

১৫ই আগস্ট
ফুটন্ত গোলাপের ঝরাপাপড়ি মালা
বিষাদসিন্ধুর ন্যায় শোকের আর এক কারবালা।
১৫ই আগস্ট
মুজিবের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার বৃথা চেষ্টা
ওঁৎ পেতে থাকা ঘাতকরা এখনো করে সে প্রচেষ্টা।
১৫ই আগস্ট
রক্তপিপাসু আজও করো ষড়যন্ত্র
২১শে আগস্ট আবার পথঘাট রক্তে রঞ্জিত।
১৫ই আগস্ট
তোমার কি মৃত্যু নেই, পেয়েছ অমরত্বের বর!
আরও কত কোল খালি করবে অবলা নারীর ঘর।

খুব চাই আজকাল

ওয়াসীম হক

জীবনকে চেখে দেখো অভিধান ঘেঁটে নয়
সবুজের বেড়ে ওঠা ডালপালা ছেঁটে নয়
আমি চাই মহিরুহ মুক্তির গান গাই
সৌন্দর্যের মানে আজকাল বনসাই!
ব্যস্ততা জয় করে কে বা পায় দেখা কার
শহরের বুকজুড়ে কংক্রিটে একাকার
মেকি হাসি খুব বেশি হৃদয়ের তন্ত্রে
ভালোবাসা খেলে যায় এটিএম যন্ত্রে।
শান্তির বারিধারা চাতকের চোখ হয়
কর্পোরেটের কালি জীবনের বড়ো ক্ষয়
নদী চরে কাশবন, নৌকার উড়ো পাল
মনজুড়ে বসবাস, খুব চাই আজকাল।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৫ই আগস্ট ২০২১ বঙ্গভবনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহান স্বাধীনতার রূপকার

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ও মহান স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৪৮ সালে ভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮-এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২-এর গণবিরোধী শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭০-এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বার বার কারাবরণ করতে হয়। ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি শোকাহত চিত্তে ১৫ই আগস্টে শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপোশহীন। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। দীর্ঘ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই মহান নেতা ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', যা ছিল মূলত স্বাধীনতারই ডাক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই আমাদের দায়িত্ব হবে জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। তাহলেই চিরঞ্জীব এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প–২০২১'-এর সফল বাস্তবায়ন সুসম্পন্ন হতে চলেছে। ২০৪১ সালে দেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে 'রূপকল্প–২০৪১'-এর বাস্তবায়নে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই। আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আত্মনিয়োগ করি।

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের ঊর্ধ্বগতি নিশ্চিত করতে হলে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির জোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বিষয়টি অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল থেকে পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ভিত্তির সূচনা করেন। ৯ই আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২১' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি একথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সাশ্রয়ী ও সচেতন করে তুলতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২১' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শিল্পকারখানার অন্যতম প্রধান জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশের অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক গ্যাসের

ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সমন্বয় থাকা আবশ্যক। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার দেশের স্থলভাগে ও সমুদ্রসীমায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন ও বিতরণের নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) বিভিন্ন উৎস থেকে জ্বালানি তেল আমদানি ও প্রক্রিয়াকরণ করে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি সৌরশক্তিসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে সরকারের প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের শেখ কামাল মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। টোকিও অলিম্পিক গেমস থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল। শেখ কামালের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রথমবারের মতো যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রবর্তিত এই পুরস্কারের জন্য ৭টি ক্যাটাগরিতে মোট ১০ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও দুটি প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শেখ কামালের বহুমুখী প্রতিভার কথা তুলে ধরেন এবং দেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি পুরস্কার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান এবং একটি জাতি গঠনে শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চাকে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাক– এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আক্তার হোসেন বিজয়ীদের হাতে এক লাখ টাকার চেক, ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন। পরে প্রধানমন্ত্রী শহিদ শেখ কামালকে নিয়ে প্রকাশিত দ্বিভাষিক স্মারকগ্রন্থ *চিরতারুণ্যের প্রতীক: অনন্য শেখ কামাল*-এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

নগদ টাকা ও সেলাই মেশিন বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকীতে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সাথে যুক্ত হন। এসময় দেশের সব জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের তালিকা অনুযায়ী ৬৪ জেলার চার হাজার অসচ্ছল নারীকে সেলাই মেশিন ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে দুই হাজার নারীকে দুই হাজার করে টাকা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

সচিব সভায় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

আগারগাঁও পরিকল্পনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষে চার বছর পর ১৮ই আগস্ট সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে কঠোর বার্তা দেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনো দফতরে দুর্নীতি হলে সেই মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট সচিবকে। এছাড়া দেশকে এগিয়ে নিতে সরকার যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, তার যথাযথ বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে এবং করোনায় বন্ধ থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্রুত খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে বলে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই আগস্ট ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সচিব সভায় সভাপতিত্ব করেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রীর অনুদানে বিনামূল্যে হার্টের বাল্ব ও রিং পাবেন রোগীরা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হৃদরোগে আক্রান্ত অসহায় ও গরিব রোগীদের বিনামূল্যে হার্টের বাল্ব, রিং ও পেসমেকার কেনার জন্য জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে তিন কোটি ২৯ লাখ টাকা অনুদান দেন। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে এককালীন এ অর্থ প্রদান করা হয়। ২২শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার কাছ থেকে অনুদানের চেক গ্রহণ করেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীর জামাল উদ্দিন।

একনেকে আট প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী পাঁচ হাজার ৪৪১ কোটি ৬৩ লাখ টাকা ব্যয়ে আট প্রকল্পের অনুমোদন দেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালিদের জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সচিবালয়ে ক্লিনিক ভবন প্রাঙ্গণে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত 'আলোকচিত্র, ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী এবং তথ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইটে বঙ্গবন্ধু ই-কর্নারের উদ্‌বোধন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ১১ই আগস্ট আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়ার সভাপতিত্বে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান এবং সচিব মো. মকবুল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১১ই আগস্ট ২০২১ সচিবালয়ে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও 'বঙ্গবন্ধু ই-কর্নার'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বাঙালি জাতিসত্তা উন্মেষের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম এই বাঙালিদের জন্য একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলা ভাষাভাষী এই অঞ্চলে অনেক স্বাধীন রাজা ছিল কিন্তু বাঙালিদের জন্য কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র রচিত হয়েছে। মানুষ সবসময় নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু একটি ঘুমন্ত জাতিকে এমনভাবে উদ্বেলিত করেছিলেন যে মানুষ নিজের প্রাণকে তুচ্ছ মনে করে যুদ্ধে গেছে এবং লাখ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ রচিত হয়েছে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) *নবারুণ* ও *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকা দুটির বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ৪ঠা আগস্ট সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠানে সচিব মো. মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং ডিএফপি'র মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া সূচনা বক্তব্য রাখেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এসময় *নবারুণ* ও *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা প্রকাশের জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মের সামনে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরার জন্য এ প্রকাশনাগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি, জাতিসত্তা সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথম বাংলাদেশ নামের এ রাষ্ট্রের রচনা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালিদের জন্য পৃথিবীতে এটিই একমাত্র জাতিরাষ্ট্র। তাই বঙ্গবন্ধুকে এবং তাঁর আদর্শকে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাংবাদিকদের চেক বিতরণ

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান বলেন, প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের জন্য ১০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। এর আগে সাংবাদিকদের এত বিপুল অঙ্কের টাকা সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার নজির নেই। করোনাকালীন সময়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সকলকেই আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

১৪ই আগস্ট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জামালপুরের সাংবাদিকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত চেক বিতরণকালে এসব কথা বলেন তিনি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ দেশের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে ৫২ জন সাংবাদিকের মাঝে ১০ হাজার টাকা করে পাঁচ লাখ ২০ হাজার এবং বিশেষ অনুদান হিসেবে এক জন সাংবাদিক পরিবারকে ৩ লাখ ও চিকিৎসার জন্য একজন সাংবাদিককে ১ লাখ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ-ভারতসহ চার দেশের বাণিজ্য যোগাযোগ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান বলেন, বাণিজ্য যোগাযোগ কেবল ব্যবসায়ীদের জন্য নয়, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশের বৃহত্তর জনস্বার্থেও জরুরি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য উদ্যোগ বাণিজ্য বাড়াতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। কর্মসংস্থান, অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং সামষ্টিক অর্থনীতির গতিশীলতাও বাড়বে।

১৭ই আগস্ট বেসরকারি গবেষণা সংস্থা উন্নয়ন সমন্বয় ও ভারতীয় গবেষণা সংস্থা কনজিউমার ইউনিটি অ্যান্ড ট্রাস্ট সোসাইটি (কাটস) ইন্টারন্যাশনালের যৌথ আয়োজনে 'বিবিআইএন দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য মাল্টি-মোডাল কানেক্টিভিটি' শীর্ষক অনলাইন আলোচনায় তিনি এসব কথা বলেন। এতে মূল নিবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের লিড ইকোনমিস্ট রবার্ট শুভ্র গুদা।

ড. আতিউর রহমান বলেন, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপাল নিয়ে গঠিত বিবিআইএন দেশগুলোর অংশীজনদের করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে সামনে রেখে আরও বেশি সহযোগিতামূলক মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। আইবিসিসিআই সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমদ বলেন, টেকসইভাবে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য সব অংশীজনের অংশগ্রহণে আরও বেশি গবেষণা ও সংলাপের প্রয়োজন। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নীলিমা আক্তার বলেন, আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য সহজীকরণের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি কর ব্যবস্থাপনার দিকে আরও নীতি-মনোযোগ দরকার রয়েছে।

সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, বাংলাদেশে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রতিবেশী দেশ (যেমন : ভারত, নেপাল ও ভুটান)-এর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। কারণ, এতে বাংলাদেশের পাশাপাশি এই প্রতিবেশী দেশগুলোও উপকৃত হবে। মূল নিবন্ধে রবার্ট শুভ্র গুদা বাংলাদেশে চারটি স্থলবন্দর, চারটি নদীবন্দর, তিনটি সমুদ্রবন্দর এবং একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রের ওপর পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে এসব স্থানে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য সহজীকরণের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

৪৮ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভের রেকর্ড

করোনা মহামারির মধ্যেও বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভ একের পর এক রেকর্ড গড়ছে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের ওপর ভর করে রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলারের

মাইলফলক অতিক্রম করে রেকর্ড গড়েছে। ২৪শে আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর কাজী ছাইদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ২৪শে আগস্ট দিনের শুরুতে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৪৬ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ১ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলারের এসডিআর বরাদ্দ (ঋণ-সহায়তা) যোগ হওয়ায় দিন শেষে রিজার্ভ ৪৮ দশমিক শূন্য ৪ বিলিয়ন ডলার বা চার হাজার ৮০৪ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। প্রতি মাসে ৪ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় হিসেবে মজুত এ বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে ১২ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছরের ৩রা মে দেশের রিজার্ভ প্রথমবারের মতো ৪৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়ায়। ওইদিন রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলারে।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালন

এখন থেকে একই তারিখে 'জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস' পালন করবে সরকার। ৯ই আগস্ট স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সায় দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রতিবছর ৬ই অক্টোবর 'জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস'-এর পরিবর্তে 'জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন অনুযায়ী, শিশু জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন এবং কেউ মারা যাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে মৃত্যু নিবন্ধন করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ৯ই আগস্ট ভার্চুয়াল মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জাতীয় জাদুঘরের নিদর্শন নষ্ট বা ধ্বংস করলে জেল-জরিমানার বিধান রেখে নতুন আইনের খসড়াও অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। জাতীয় জাদুঘরের স্থাবর নিদর্শন ধ্বংস বা ক্ষতি করলে ১০ বছর কারাদণ্ড, ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দেওয়া যাবে। নিদর্শন চুরি, পাচার বা ক্ষতি করলে পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দেওয়া যাবে। এছাড়া নিদর্শনের ওপর খোদাই করে লিখলে বা স্বাক্ষর করলে এক বছরের কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইনেরও খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। যদি কেউ টিকিট ছাড়া চিড়িয়াখানায় ঢোকে, তাকে দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছিল। মন্ত্রিসভা সেটি পরিবর্তন করে দুই মাসের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানার বিধান রেখেছে। প্রস্তাবিত আইনে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধীরা যাতে বিশেষ সুবিধায় চিড়িয়াখানা দেখতে পারে সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট আইনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

'যোগাযোগ' প্ল্যাটফরম

তৈরি করা হচ্ছে ফেসবুকের বিকল্প নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফরম 'যোগাযোগ'। আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে এই প্ল্যাটফরম তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এর মাধ্যমে দেশের উদ্যোক্তারা তথ্য, উপাত্ত এবং যোগাযোগের জন্য নিজেদের মধ্যে একটি নিজস্ব অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও গ্রুপ তৈরি করতে পারবে। উদ্যোক্তাদের বিদেশনির্ভর হতে হবে না। ২৪শে জুলাই 'এন্টারপ্রেনারশিপ মাস্টারক্লাস সিরিজ ২'-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ৭ই আগস্ট ২০২১ বিইউবিটি আয়োজিত 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন সায়েন্স অ্যান্ড কনটেম্পোরারি টেকনোলজিস' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

ফেসবুকভিত্তিক উইমেন ই-কমার্স (উই) আয়োজিত অনুষ্ঠানে পলক বলেন, আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে এরই মধ্যে জুম অনলাইনের বিকল্প বৈঠক প্ল্যাটফরম এবং করোনা প্রতিরোধে ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম *সুরক্ষা* অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। নিজস্ব যোগাযোগের জন্য হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প 'আলাপন' নামে প্ল্যাটফরম তৈরি করা হচ্ছে। এসময় তিনি আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফরমসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফরম তৈরির কার্যক্রমের বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, উইমেন ই-কমার্স এই প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে উপকৃত হবে।

সকল সেক্টরে ডিজিটালাইজেশন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ভবিষ্যতে টিকে থাকতে সকল সেক্টরের ডিজিটালাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই। এলক্ষ্যকে সামনে রেখে সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা এক হাজারেরও বেশি ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট তৈরি করেছি। ৭ই আগস্ট বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি'তে (বিইউবিটি) 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন সায়েন্স অ্যান্ড কনটেম্পোরারি টেকনোলজিস (আইসিএসসিটি)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্বারোপ করে আইসিটি বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরেন জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, দেশের আইটি, আইটিএস খাত থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় ও ১৫ লাখ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে আইসিটি বিভাগ।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষিপণ্যের রপ্তানি আয় ১০০ কোটি ডলারের মাইলফলকে

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, ১০ বছর আগেও কৃষিপণ্যের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৪০ কোটি ডলার। চার বছর ধরে খাতটির রপ্তানি আয় বাড়ছে। সর্বশেষ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাতটির রপ্তানি আয় ১৯ শতাংশ বেড়েছে। যদিও পুরো বছরটিই করোনা মহামারির মধ্যেই কেটেছে। তারপরও এক বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার রপ্তানি আয়ের মাইলফলকে পৌঁছে গেছে কৃষিপণ্য। বিদায়ী অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ১০২ কোটি ৮১ লাখ ডলারের কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়েছে। তার মধ্যে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের হিস্যাই বেশি।

কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মধ্যে বেশি রপ্তানি হয় রুটি, বিস্কুট ও চানাচুর জাতীয় শুকনা খাবার, ভোজ্যতেল ও সমজাতীয় পণ্য, ফলের রস, বিভিন্ন ধরনের মসলা, পানীয় এবং জ্যাম-জেলির মতো বিভিন্ন সুগার কনফেকশনারি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিস্কুট, রুটি জাতীয় শুকনা খাবার রপ্তানি করে বিদায়ী অর্থবছরে দেশীয় কোম্পানিগুলো ২৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার আয় করেছে, যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় ৪৬ শতাংশ বেশি। তার বাইরে চা, শাকসবজি ও ফলমূলও রপ্তানি হয়েছে।

হোম টেক্সটাইলের ক্রেতারা বাংলাদেশমুখী

এক দশকের বেশি সময় ধরে রপ্তানিতে বড়ো অবদান রাখছে হোম টেক্সটাইল। খাতটি নিয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য না হলেও বিদায়ী অর্থবছরে ১১৩ কোটি ডলারের রপ্তানি আয় এসেছে এ খাত থেকে। তাতে খাতটির রপ্তানি আয়ে আগের বছরের চেয়ে ৪৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ঘরে ব্যবহার্য বস্ত্রপণ্যই হোম টেক্সটাইল। যেমন– বিছানার চাদর, বালিশ ও বালিশের কভার, টেবিল ক্লথ, পর্দা, ফ্লোর ম্যাট, কার্পেট, আসবাবে ব্যবহৃত কুশন ও কভার, খাবার টেবিলের রানার, কৃত্রিম ফুল, নকশিকাঁথা, কম্বলের বিকল্প কমফোর্টার, বাথরুম টাওয়েল ইত্যাদি।

জানা যায়, বর্তমানে বিশ্বের ৪৭টি দেশে বাংলাদেশের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। তবে আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকায় রয়েছে বাংলাদেশের বড়ো বাজার। হোম টেক্সটাইল খাতে ১৪৭টি প্রতিষ্ঠান থাকলেও বর্তমানে রপ্তানি করছে ৬০টি। যেমন বিদায়ী অর্থবছরের আগের চার বছর রপ্তানি ছিল ৭৫ থেকে ৮৭ কোটি ডলারের মধ্যে। বিদায়ী অর্থবছরটি পুরোপুরি করোনায় আক্রান্ত ছিল। তার মধ্যেও হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি এক লাফে ৩৮ কোটি ডলার বেড়ে যাওয়ায় শতকোটি ডলারের রপ্তানি আয়ের ঘরে পৌঁছে যায়।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

টিকা নিবন্ধন করতে পারবে শিক্ষার্থীরা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ বছর হলেই তারা এখন টিকা নিতে নাম নিবন্ধন করতে পারবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের (এমআইএস) পরিচালক মিজানুর

রহমান সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের করোনাভাইরাসের টিকার আওতায় আনতে বিশেষ বিবেচনায় তাদের বয়সসীমা কমিয়েছে সরকার। দ্রুত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিতেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত বলেও জানান তিনি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, এখন ১৮ বছরের বেশি বয়সি শিক্ষার্থীরা টিকার জন্য নিবন্ধন করতে পারবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এরই মধ্যে এ বিষয়ে আইসিটি বিভাগকে নির্দেশনা দিয়েছে। টিকা নিবন্ধনের *সুরক্ষা* অ্যাপে এখন আঠারোর বেশি বয়সি সব শিক্ষার্থীর নিবন্ধনের সুযোগ মিলছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই আগস্ট আগারগাঁও পরিকল্পনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সচিব সভায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী এক বার্তায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়া দরকার বলে মনে করেন এবং খুব দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, স্কুলগুলোও কারণ বাচ্চারা ঘরে থাকতে থাকতে তাদেরও কষ্ট হচ্ছে। সেদিকে নজর দেওয়া দরকার বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

দাখিলে তিন ও আলিমে ছয় বিষয়ে পরীক্ষার সিদ্ধান্ত

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ৩রা আগস্ট রাতে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২১ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দাখিলে তিন এবং আলিমে ছয় বিষয়ে পরীক্ষা হবে। তবে যেসব বিষয়ে পরীক্ষা হবে না, সেগুলোতে গ্রেড দেওয়া হবে জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষার ভিত্তিতে সাবজেক্ট ম্যাপিং-এর মাধ্যমে। আর পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব না হলে সব বিষয়েই পরীক্ষার্থীদের নম্বর বা গ্রেড দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

wewb‡qvM: we‡kl cwZ‡e`b

শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ

রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি অটোমোবাইল, চিনি, এগ্রো ফুড প্রসেসিং এবং জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প সম্প্রসারণে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান জানান। জাপান সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অটোমোবাইল ও সার কারখানা স্থাপনে বিনিয়োগের আশ্বাস প্রদান করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১৮ই আগস্ট জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময়ে উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, জাপান বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অকৃত্রিম বন্ধুরাষ্ট্র। সুদীর্ঘ সময় ধরে শিল্পায়ন, ব্যাবসাবাণিজ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে দুই দেশ একে অপরের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। পারস্পরিক সহযোগিতার এ ক্ষেত্রসমূহ আগামীতে আরও বিস্তৃত হবে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্পকারখানা স্থাপন ও ব্যাবসাবাণিজ্যসহ বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে শিল্প প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং ব্যাবসাবাণিজ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে রয়েছে। সিরাজগঞ্জে নতুন সার কারখানা এবং বাংলাদেশে একটি অটোমোবাইল টেস্টিং ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপনে জাপানের রাষ্ট্রদূত তার সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

বাংলাদেশে বিনিয়োগে ফেসবুকের আগ্রহ

ফেসবুক বাংলাদেশে ডিজিটাল অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে কাজ করছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের উপস্থিতিতে ৯ই আগস্ট ফেসবুক কর্তৃপক্ষ ও বিটিআরসি'র মধ্যে বিনিয়োগ সংক্রান্ত এক উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মো. আফজাল হোসেন এবং বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদার বক্তৃতা করেন। বৈঠকে ফেসবুকের সিঙ্গাপুর আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে বাংলাদেশ বিষয়ক হেড অব পাবলিক পলিসি সাবনাজ রশিদ দিয়া, হেড অব কানেকটিভিটি টম সি ভার্গিস ও কানেকটিভিটি অ্যাফেয়ার্স কর্মকর্তা তাহানি ইকবাল ফেসবুকের প্রতিনিধিত্ব করেন। বৈঠকে বিটিআরসি'র মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. নাসিম পারভেজ বাংলাদেশের টেলিকম খাতের অগ্রগতির চিত্র উপস্থাপন করেন।

মন্ত্রী বাংলাদেশের টেলিকম খাতের সার্বিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে বলেন, ডিজিটাল সংযোগ খাত বিনিয়োগের একটি থ্রাস্ট সেক্টর। আমাদের ডিজিটাল অবকাঠামো গত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে এবং তথ্য ও যোগাযোগ উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক নির্দেশনায় যুগান্তকারী অগ্রগতি অর্জন

করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, কোভিডকালে দেশের মানুষের অচল জীবনযাত্রাকে ডিজিটাল সংযোগের অসামান্য অগ্রগতির কারণে সচল রেখেছে। ছোটো ব্যাবসা থেকে শুরু করে অফিস-আদালতের কার্যক্রম এবং শিক্ষা কার্যক্রম ঘরে বসে করা সম্ভব হচ্ছে। আমাদের শক্তিশালী ডিজিটাল অবকাঠামো না থাকলে তা সম্ভব হতো না বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

ফেসবুক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ কাজে লাগাতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারা মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ কয়েকটি দেশে এক্সপ্রেস ওয়াইফাই, টেরাগ্রাফ, ওপেন ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক এবং জিরো রেটেড প্রোগ্রামের কার্যক্রম তুলে ধরেন। বর্তমানে দেশে চার কোটি ৮০ লাখ ফেসবুক ব্যবহারকারী রয়েছে। ব্যবহারকারীর দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ দশম।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

মাতৃত্বকালীন ভাতার মেয়াদ বাড়ছে

মাতৃত্বকালীন ভাতার মেয়াদ দুই বছর থেকে বাড়িয়ে তিন বছর করার পরিকল্পনা করেছে সরকার। ২রা আগস্ট মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ২রা আগস্ট ২০২১ 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২১' -এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

সপ্তাহটি ভার্চুয়ালি উদ্‌বোধন করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ পান করলে শিশুর মৃত্যুঝুঁকি ৩১ ভাগ কমে যায়। উল্লেখ্য, এ বছর দেশে ২রা আগস্ট থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন করা হয়। এবারে এর প্রতিপাদ্য ছিল– 'মাতৃদুগ্ধদানের সুরক্ষায়: সকলের সম্মিলিত দায়'।

মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় রানারআপ কিশোয়ার

এবারের মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় রানারআপ (তৃতীয় স্থান) হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রতিযোগী কিশোয়ার চৌধুরী। ১৩ই জুলাই মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়ার গ্র্যান্ড ফিনালেতে তিনি এ স্থান অর্জন করেন। দুই দিনের গ্র্যান্ড ফিনালের প্রথম দিনে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলেন কিশোয়ার। দ্বিতীয় দিন শেষে ১১৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থান পান তিনি।

১৯শে এপ্রিল শুরু হয় রান্না বিষয়ক জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'মাস্টারশেফ অস্ট্রেলিয়া'। সেরা ২৪ জনকে নিয়ে শুরু হওয়া এ প্রতিযোগিতায় অন্যতম দর্শকপ্রিয় প্রতিযোগী ছিলেন কিশোয়ার। বাংলাদেশি খাবার রান্না ও পরিবেশন করা নিয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন তিনি। বাছাই পর্বে মাছ আর কাঁচা আমের রেসিপিসহ একের পর এক বাংলাদেশি খাবার মাস্টারশেফের মঞ্চে তুলেছেন কিশোয়ার। বাদ যায়নি খাসির রেজালা আর ঘিয়ে ভাজা পরোটা, নেহারি এবং পান্তা-ইলিশ আর আলু ভর্তার মতো বাঙালি খাবারও। দুই সন্তানের মা কিশোয়ার অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের মেলবোর্নের বাসিন্দা। তিনি পেশায় বিজনেস ডেভেলপার। বাংলাদেশি ব্যবসায়ী কামরুল হোসাইন চৌধুরী এবং লায়লা চৌধুরীর সন্তান কিশোয়ার।

সেরা অনলাইন পারফর্মার মল্লিকা সাহা

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্তৃক পরিচালিত পোর্টার শিক্ষকদের প্রিয় প্ল্যাটফরম শিক্ষক বাতায়নের অনলাইন পারফর্মার ক্যাটাগরিতে সেরা মনোনীত হয়েছেন নরসিংদী সদর উপজেলার চৈতাব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মল্লিকা সাহা। ৫ই আগস্ট *প্রথম আলো* পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়। মল্লিকা সাহা করোনা মহামারির এ পুরো সময়জুড়ে স্বপ্রণোদিত হয়ে লাইভ ক্লাস নিয়েছেন। সারা দেশের শিক্ষার্থীরা এতে উপকৃত হয়েছে।

মল্লিকা সাহা পাঁচ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৩ জন শিক্ষকের মধ্যে সেরা অনলাইন পারফর্মার মনোনীত হন। এর আগে ২০২০ সালে তিনি আইসিটি ফর ই-জেলা অ্যাম্বাসেডর নির্বাচিত হন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

জেলেদের জন্য নয় হাজার ৪৭৪ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ

সরকারের মানবিক খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলেদের জন্য আরো নয় হাজার ৪৭৪ দশমিক ৬২ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা নিবন্ধিত জেলেদের জন্য এ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে দেশের সামুদ্রিক জলসীমায় ২০শে মে থেকে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালে উপকূলীয় ১৪টি জেলার ৬৭টি উপজেলা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর মাছ ধরা থেকে বিরত দুই লক্ষ ৯৯ হাজার ১৩৫টি জেলে পরিবারের জন্য ৮ হাজার ৯৭৪ দশমিক ৫ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ২য় ধাপে পরিবার প্রতি মাসিক ৪০ কেজি হারে ২৩ দিনের জন্য ৩০ কেজি চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এর আগে ১ম ধাপে গত মে মাসে পরিবার প্রতি মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪২ দিনের জন্য মোট ৫৬ কেজি চালে এ খাতে বিতরণ করা হয়েছে। অপরদিকে কাপ্তাই

হ্রদে মাছ ধরা বন্ধকালে হ্রদ তীরবর্তী রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার ১০টি উপজেলার মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা ২৫ হাজার ৩১টি জেলে পরিবারের জন্য ৫০০ দশমিক ৬২ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ২য় ধাপে পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি হারে এক মাসের জন্য ২০ কেজি চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এর আগে গত এপ্রিল মাসে ১ম ধাপে পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি হারে দুই মাসের জন্য ৪০ কেজি চাল এ খাতে বিতরণ করা হয়েছে।

১৩ই জুলাই সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে এ সংক্রান্ত পৃথক দুটি মঞ্জুরি আদেশ জারি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক কৃষি পদক পেল 'বিনা'

কৃষিতে নানা উদ্ভাবনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)। পরমাণু শক্তি ব্যবহার করে কৃষিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক কৃষি পদক পেল বিনা। ময়মনসিংহে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শামছুন্নাহার বেগমও পেয়েছেন পুরস্কার। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এই পুরস্কার দিয়েছে।

৩রা আগস্ট বিনা'র সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। বিনা সূত্রে জানা গেছে, প্রতি দুই বছর অন্তর সারা বিশ্বের কৃষি ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য পুরস্কার দিয়ে থাকে আইএইএ এবং এফএও। বিনা যে পুরস্কার পেয়েছে সেটির নাম 'অসামান্য অর্জন পদক'। বিনা'র বিজ্ঞানীরা পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ধান, গম, পাট, ডাল, তেল ও অন্যান্য ফসলের উচ্চফলনশীল ও উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছেন। এক্ষেত্রে 'মিউটেশনাল ব্রিডিং' এবং 'কনভেনশনাল ব্রিডিং' ও প্রজননের অন্যান্য উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ করে থাকেন তারা। এছাড়া নিত্যনতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এই বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এসব কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিনা'কে এই পদকে ভূষিত করেছে আইএইএ এবং এফএও। একইসঙ্গে 'উইমেন ইন প্ল্যান্ট মিউটেশন ব্রিডিং অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন বিনা'র মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শামছুন্নাহার বেগম।

দেশের প্রথম কৃষি বিপণনের অ্যাপ 'সদাই'

অনলাইনে কৃষিপণ্য কেনাবেচার মোবাইল অ্যাপ 'সদাই'-এর উদ্‌বোধন করেছেন কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক। ৪ঠা আগস্ট সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, কৃষিপণ্য কেনাবেচায় 'সদাই' অ্যাপটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ অ্যাপ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস, কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত হবে। একইসঙ্গে ভোক্তারা যাতে না ঠকে, প্রতারণার শিকার না হয় এবং নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত পণ্য পায়, তাতে অ্যাপটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশে ধান, গম, ভুট্টা, শাকসবজি, ফলমূলসহ সব কৃষিপণ্যের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, উৎপাদনে বিস্ময়কর সাফল্য এসেছে। এসব উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বিপণনই এখন সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। কৃষকেরা যে পণ্য উৎপাদন করেন, তা অনেক সময় বাজারজাত করতে পারেন না, সঠিক মূল্য পান না। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের পাশাপাশি ভোক্তার সঠিক মূল্যে, নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত পণ্য কেনার নিশ্চয়তাও দিতে হবে। এলক্ষ্যে 'সদাই' অ্যাপটি কাজ করবে।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ৪ঠা আগস্ট ২০২১ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষিপণ্য কেনাবেচার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মোবাইল অ্যাপ 'সদাই'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

উল্লেখ্য, 'সদাই' সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের প্রথম কৃষি বিপণন অ্যাপ। এর ভাষা বাংলা। 'সদাই' অ্যাপ বাস্তবায়ন করছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। এর সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। এটির মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার সরাসরি যোগাযোগ হবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর 'সদাই' প্ল্যাটফরমে লেনদেন হওয়া কৃষিপণ্যের গুণগত মান ও ক্রয়বিক্রয় মনিটরিং করবে। পণ্যগুলোর উপযুক্ত দাম নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনে উদ্যোক্তার নিবন্ধন বাতিল করবে। অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা ও অধিদপ্তর পরিচালিত কল সেন্টার থাকবে।

কৃষক ও উদ্যোক্তারা ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করে কমিশনবিহীন বিক্রির সুযোগ পাবেন। মোবাইল ব্যাংকিং পেমেন্ট এবং ক্যাশ অন ডেলিভারি পেমেন্টের সুযোগ পাওয়া যাবে। মূল্য যাচাইয়ের সুযোগ ও অর্ডারকৃত পণ্যের ট্র্যাকিং সুবিধা রয়েছে। অধিদপ্তর কৃষক ও উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ক্ষেত্রবিশেষে কৃষিপণ্যের পরিবহণ সুবিধা পাওয়া যাবে।

ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের জন্য 'সদাই' অ্যাপ আলাদা। গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে অ্যাপটি।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

তহবিল বাড়ানোর আহ্বান

জলবায়ু পরিবর্তন এবং চলমান করোনা মহামারির প্রভাব মোকাবিলায় আরও তহবিল সরবরাহ করতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৮ই জুলাই গণভবন থেকে 'প্রথম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অর্থ সম্মেলন (ভার্চুয়াল)'-এর উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ প্রথম অর্থমন্ত্রীদের জন্য এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জুলাই ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের আয়োজনে '1st V20 Climate Vulnerables Finance Summit'-*এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন– পিআইডি*

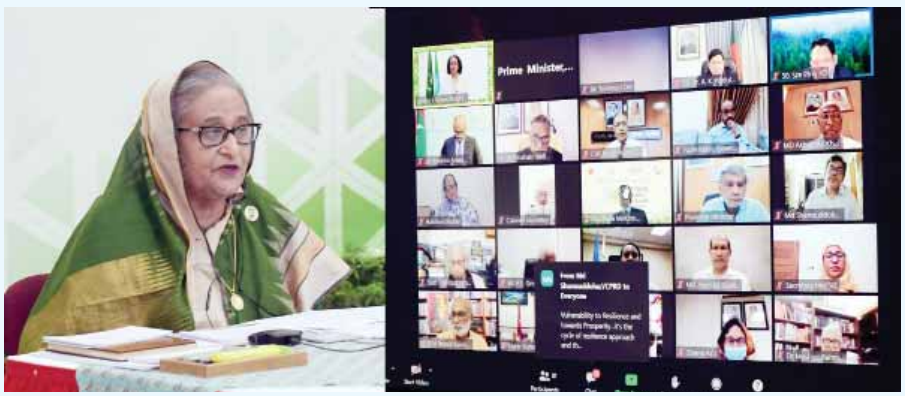

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় প্রযুক্তি স্থানান্তর ও অতিরিক্ত তহবিলের ব্যবস্থা করা উচিত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও উন্নত দেশগুলোকে তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব এবং নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতা পালন করা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিভিএফ-ভি টোয়েন্টি গ্রুপের ৪৮ সদস্য-রাষ্ট্রের মাধ্যমে নির্গত হয় বৈশ্বিক নিঃসরণের মাত্র ৫ শতাংশ, কিন্তু তারাই এ মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। করোনা মহামারি পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত করার মাধ্যমে চলমান কোভিড-১৯ মহামারি নতুন করে মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট যোগ করেছে। চলমান ও ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলায় আমাদের অবশ্যই ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী পাঁচ দফা প্রস্তাব রাখেন। প্রথম প্রস্তাবে শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে রাখতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন রোধে প্রতিটি দেশকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য অনুসরণ করতে হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে তিনি বলেন, উন্নত দেশগুলোর উচিত সিভিএফ-ভি ২০ দেশের সবুজ পুনরুদ্ধারের সুবিধার্থে এবং মূলধনের ব্যয় হ্রাস ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য নিবেদিত সমর্থন করা। তৃতীয় প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তহবিলের প্রবাহ অবশ্যই অনুমানযোগ্য, ভারসাম্যপূর্ণ, উদ্ভাবনী ও বর্ধনশীল হতে হবে। চতুর্থ প্রস্তাবে তিনি জলবায়ুর ক্ষতির মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর আহ্বান জানান। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সক্রিয়ভাবে 'মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান'-এর মতো 'ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান' গ্রহণ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্ল্যান প্রস্তুত করছে বাংলাদেশ এবং ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (এনডিসি) চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে। তাঁর সরকার একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত, জলবায়ু পরিবর্তন-সহনশীল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' প্রস্তুত করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘের আওতাধীন নতুন সিভিএফের এবং ভি টোয়েন্টি জয়েন্ট মাল্টি-ডোনার ফান্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দাতা দেশ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ একটি 'প্ল্যানেটারি ইমারজেন্সি' ঘোষণা করেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা বিশ্বের অন্য নেতাদের কাছ থেকেও এ ধরনের পদক্ষেপ আশা করছি। বাংলাদেশ 'খুরুশকুল স্পেশাল শেল্টার প্রজেক্ট' নামে বিশ্বের সর্ববৃহৎ জলবায়ু শরণার্থী পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এতে ১৩৯টি সুউচ্চ ভবনে ৪ হাজার ৪০৯টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হবে। শেখ হাসিনা বলেন, সিভিএফ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে বের হয়ে একটি টেকসই জলবায়ু-সহনশীল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং এরপর জলবায়ু পরিবর্তন-সহনশীল ব্যবস্থা থেকে জলবায়ু সমৃদ্ধির দিকে এগোতে একটি নতুন জলবায়ুসমৃদ্ধ কার্যক্রম শুরু করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর সম্মানে 'মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান ডিকেড-২০৩০' ঘোষণা করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিবছর আমরা আমাদের জিডিপি'র প্রায় ২.৫ শতাংশ বা প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় টেকসই জলবায়ু-সহনশীল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যয় করি।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

we`y¨r: we‡kl cÖwZ‡e`b

বিদ্যুৎ সেবা পাওয়া গ্রাহকের অধিকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, উন্নত বিদ্যুৎ সেবা পাওয়া গ্রাহকদের অধিকার। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) গ্রাহক বর্তমানে ৩ কোটি ১৮ লাখ। পরিকল্পনা মাফিক গ্রাহকদের দোরগোড়ায় উন্নত সেবা পৌঁছে দিতে হবে। গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এলক্ষ্য নিয়ে

কাজ করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী ১৭ই আগস্ট পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

নসরুল হামিদ আরও বলেন, গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিককরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দূর করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আমার গ্রাম-আমার শহর' প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন–যা বাস্তবায়নের নেপথ্যে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বিদ্যুৎ তথা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড। তিনি এসময় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ব্যবহারে গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করতেও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবদান রাখতে হবে।

বিদ্যুতে চলবে মেট্রোরেল

স্বপ্নের মেট্রোরেল চালু হলে বৈদ্যুতিক রেল যুগে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে পরীক্ষামূলক মেট্রোরেল চালানো শুরু হয়েছে। মেট্রোরেল প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা ১৮ই আগস্ট সংবাদ মাধ্যমকে জানায়, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরাসরি গ্রিড থেকে মেট্রোরেলে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কোনো আশঙ্কা থাকছে না। আপাতত রাজধানীর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রোরেল চালাতে প্রয়োজন হচ্ছে ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। এরই মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সব প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে। জানা গেছে, চলতি মাসের শেষ দিকে ভায়াডাক্টের (যার ওপর মেট্রোরেল চলবে) ওপর ট্রেন উঠাতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এজন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎও প্রস্তুত আছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মেট্রো চালু হলে গণপরিবহণে ডিজেলের ব্যবহার কমবে, কমবে কার্বন নিঃসরণ। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরাসরি গ্রিডলাইন থেকে সরবরাহের মাধ্যমে এ প্রকল্পে বিদ্যুৎ যাবে। আর এর ব্যবস্থাপনায় থাকবে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)। মেট্রোতে গ্রিড থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দিয়াবাড়িতে ১৩২ কেভি উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর বাইরে মতিঝিলে একই ক্ষমতার আরেকটি উপকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এরই মধ্যে মেট্রোরেলের পিলারের ওপর থাকা স্প্যানে বৈদ্যুতিক খুঁটি বসানো হয়েছে। মেট্রোর জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করছে জাপানের মারুবেনি করপোরেশন ও ভারতের এল অ্যান্ড টি (লারেসেন অ্যান্ড টারবো)। প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো চালাতে ৮০ মেগাওয়াট এবং পরে মতিঝিল থেকে চালু করতে আরও ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

wbivc` moK : we‡kl cwZ‡e`b

সড়কে শতভাগ যাত্রী নিয়ে চলাচল

১৯শে আগস্ট থেকে পুরোদমে চলবে গণপরিবহণ। যদিও আগে থেকেই ট্রেন ও লঞ্চ শতভাগ যাত্রী নিয়ে চলাচল শুরু করেছে। ১৯শে আগস্ট থেকে বাসও শতভাগ যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে পারবে। বিনোদন কেন্দ্র ও গণপরিবহণ পুরোপুরি খুলে দিয়ে ১২ই আগস্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আসন সংখ্যার অর্ধেক ব্যবহার করে পর্যটন, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদন কেন্দ্রগুলোও খুলতে পারবে।

৩রা আগস্ট অনুষ্ঠিত কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখা এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় চলমান বিধিনিষেধের ধারাবাহিকতায় নতুন করে চারটি শর্ত দিয়ে ১৯শে আগস্ট থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন করে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চারটি শর্তের মাধ্যমে মূলত চলাচল ও কার্যক্রমে আরও শিথিলতা আসলো।

শর্তগুলো হলো

১. যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সড়ক, রেল ও নৌপথে সকল প্রকার গণপরিবহণ চলাচল করতে পারবে।

২. পর্যটন কেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদন কেন্দ্র আসন সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ ব্যবহার করে চালু করতে পারবে।

৩. সকলক্ষেত্রে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৪. যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে অবহেলা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব বহন করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিধিনিষেধ শেষে ১১ই আগস্ট থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মোটামুটি সবকিছু খুলে দিয়েছে সরকার। ১০ই আগস্ট থেকেই ৩৮ জোড়া আন্তঃনগর ও ১৯ জোড়া মেইল-কমিউটার ট্রেন দিয়ে সীমিত আকারে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ট্রেন চলাচল শুরু করে। এদিন থেকে বাড়তি ভাড়া প্রত্যাহার করে শতভাগ আসনে যাত্রী নিয়ে চলছে লঞ্চ।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশেই উৎপাদিত হবে করোনার টিকা

এবার দেশেই করোনার টিকা উৎপাদিত হবে। এর মধ্য দিয়ে করোনার টিকা উৎপাদনে বাংলাদেশ বৈশ্বিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে। ১৬ই আগস্ট টিকা উৎপাদন নিয়ে মহাখালীর বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জন (বিসিপিএস)

মিলনায়তনে সিনোফার্ম, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ইনসেপ্টা ভ্যাকসিন লিমিটেডের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক সাংবাদিকদের বলেন, ইনসেপ্টা তিন মাসের মধ্যে টিকা তৈরি করতে পারবে বলে জানিয়েছে। চীন থেকে বাল্ক এনে (প্রস্তুতকৃত বিপুল পরিমাণ টিকার বড়ো পাত্র) এদেশে ইনসেপ্টা তা ফিল ফিনিশ (শিশিজাত) করবে। ১০ ডোজের ভায়েল হলে মাসে চার কোটি টিকা তৈরি করতে পারবে বলেও জানিয়েছে ইনসেপ্টা। এছাড়া সরকারিভাবে টিকা তৈরির প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান। দেশে উৎপাদন করা হলে বাংলাদেশের মানুষের করোনার টিকার প্রাপ্যতা সহজ হবে।

করোনা টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন পৌনে দুই কোটি মানুষ

দেশে ১২ই আগস্ট পর্যন্ত প্রায় পৌনে দুই কোটি মানুষ করোনাভাইরাসের টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। আর ৫০ লাখের বেশি মানুষ দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন। 'করোনা ও ডেঙ্গু মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব তথ্য জানান।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির প্রথম দিনে অর্থাৎ ৭ই আগস্ট প্রায় ৩০ লাখের বেশি মানুষকে করোনা টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত টিকা দেওয়ার পাশাপাশি দেশের চার হাজার ৬০০ ইউনিয়ন, পৌরসভার এক হাজার ৫৪টি ওয়ার্ড ও ১২টি সিটি করপোরেশনের ৪৩৩টি ওয়ার্ডে ছয় দিনের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে ৩২ লাখ মানুষকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিল স্বাস্থ্য বিভাগ। উল্লেখ্য, প্রথম দিনেই লক্ষ্যের ৯২ থেকে ৯৫ শতাংশ টিকা দেওয়া হয়েছে।

করোনা চিকিৎসায় চালু হলো ফিল্ড হাসপাতাল

করোনা রোগীদের চিকিৎসায় চালু হয়েছে ৩৫৭ শয্যার একটি ফিল্ড হাসপাতাল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ফিল্ড হাসপাতাল' নামের এই হাসপাতালটি। ৭ই আগস্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক এর উদ্‌বোধন করেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী জানান, করোনা রোগীর চিকিৎসায় এ হাসপাতালে আছে ৪০টি আইসিইউ, কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য একটি ১০ হাজার লিটার ধারণক্ষমতার ট্যাংক। থাকছে ভর্তি রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা। হাসপাতালটি পর্যায়ক্রমে এক হাজার শয্যায় উন্নীত করা হবে বলেও মন্ত্রী জানান।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

পদ্মা সেতুর নিচ দিয়ে ভারী যানবাহন নিয়ে ফেরি চলাচল নিষিদ্ধ

পদ্মা সেতুর পিলারে বার বার ফেরি ধাক্কার ঘটনায় সেতুর নিচ দিয়ে ভারী যানবাহন নিয়ে ফেরি চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেতুর নিচ দিয়ে শুধুমাত্র হালকা যানবাহন নিয়ে ফেরি চলাচল করতে পারবে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। ১০ই আগস্ট সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্রোতের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত কোনো ভারী যানবাহন পারাপার হবে না শিমুলিয়া-বাংলাবাজার রুটে। অ্যাম্বুলেন্স ও হালকা যান পারাপার হবে। যাত্রীবাহী যান পারাপার হবে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ঘাট দিয়ে। পণ্যবাহী যান পারাপারে চাঁদপুরের হরিণাকে ঘাট ব্যবহার করতে হবে। এসব ঘাটে ফেরির সংখ্যা বাড়ানো হবে।

ঢাকায় নামবে আরও দুই মেট্রো ট্রেনসেট

তৃতীয় এবং চতুর্থ ট্রেনসেট ২২শে জুন জাপানের কোবে সমুদ্রবন্দর থেকে জাহাজে করে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে ২০শে জুলাই বাংলাদেশের মোংলা সমুদ্রবন্দরে পৌঁছায়। মোংলা বন্দরের শুল্ক ও ভ্যাট সম্পর্কিত কার্যাদি চলছে। এসব কাজ শেষে ঢাকার উত্তরার ডিএমটিসিএল ডিপোতে এসে পৌঁছাবে। চলতি আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই ঢাকায় পৌঁছাবে ট্রেনসেট। উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল রুটে চলবে এই রেল দুটি।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে নৌযানে চলাচল

স্বাস্থ্যবিধি মেনে নৌযানে চলাচল করতে যাত্রী সাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, লঞ্চে যাত্রীদের শতভাগ মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চললে এবং মাস্ক পরিধান না করলে যাত্রীদেরকে জরিমানা করা হবে। লকডাউন শিথিল হলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে কঠোর।

প্রতিমন্ত্রী ১৪ই জুলাই ঢাকায় সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সাথে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী সদরঘাটের লঞ্চ টার্মিনালের উন্নয়ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সবুজায়ন দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি এটাকে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের মতো হয়েছে বলে জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এসব উন্নয়ন হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী সদরঘাটে সুন্দরবন-১০ লঞ্চ ঘুরে দেখেন। লঞ্চের ডেকে যাত্রীদের প্রত্যক্ষ করেন। লঞ্চে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে মালিক-শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, লঞ্চের কেবিন যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে না। ডেকের যাত্রীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বিআইডব্লিউটিএ, লঞ্চ মালিক-শ্রমিক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী পদক্ষেপ নিবে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি চাকরিতে ২১ মাসের ছাড়

কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে নিয়োগ কার্যক্রম আটকে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীদের সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সে ২১ মাসের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই ছাড়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে ১৯শে আগস্ট নির্দেশনা দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়ার পর এ নির্দেশনা দেওয়া হলো।

আদেশে বলা হয়েছে, যেসব মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও তার অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর এবং সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত বা জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন শ্রেণির সরকারি চাকরিতে (বিসিএস ছাড়া) সরাসরি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারেনি, সেসব প্রতিষ্ঠানকে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিতব্য বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের বয়সসীমা গত বছরের ২৫শে মার্চ নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ ২০২০ সালের ২৫শে মার্চ যাদের বয়স ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছিল তারা ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জারি করা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করতে পারবেন। ফলে তারা ২১ মাসের ছাড় পাবে।

রেমিটেন্স বিতরণ সহজ করতে এনসিসি ব্যাংকের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চুক্তি

১৬ই আগস্ট প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স (এনসিসি) ব্যাংকের সঙ্গে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সকল শাখা থেকে প্রবাসীদের রেমিটেন্স বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ করতে এনসিসি ব্যাংকের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ও প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন, প্রবাস আয় দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনা মহামারির কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দাভাব চললেও প্রবাস আয়ের ধারা ঊর্ধ্বমুখী। দেশের উন্নয়নে প্রবাস আয় তথা বৈদেশিক কর্মসংস্থানের অবদান টিকিয়ে রাখতে হলে প্রবাসীদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। এরই অংশ হিসেবে প্রবাসীদের রেমিটেন্স বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ করতে এই চুক্তি করা হয়েছে। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, এই চুক্তির ফলে প্রবাসীরা উপকৃত হবে। উল্লেখ্য, এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে এখন থেকে বিভিন্ন Exchange House-এর মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ৮৬টি শাখা থেকে প্রেরিত রেমিটেন্স সরাসরি গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী, মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী ছিল ৮ই আগস্ট। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯৩০ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার খুনিদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। জাতির পিতার নাম স্বদেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী পরম শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হওয়ার নেপথ্যে ছিলেন তাঁর প্রিয় সহধর্মিণী ফজিলাতুন নেছা মুজিব। যাঁর ডাক নাম ছিল রেণু। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাকগুলোতে বাস্তবোচিত ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত দিয়ে তিনি বাঙালির জাতীয় সংগ্রামকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ায় ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবারই প্রথম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। জাতির পিতার সহধর্মিণী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিনকে 'ক' শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়– 'বঙ্গমাতা সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী'। সারা দেশব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ৮ই আগস্ট বঙ্গমাতার ৯১তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এদিন সকালে আওয়ামী লীগ রাজধানীর বনানী কবরস্থানে তাঁর কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে কোরানখানি ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। এর আগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের শেখ হাসিনার পক্ষে ও পরে দলের পক্ষে কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে বঙ্গমাতার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছার ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১' প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেন। ৮টি ক্ষেত্রে নারীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বোচ্চ পাঁচ জন বাংলাদেশি নারীকে এ পদক দেওয়া হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৬ই আগস্ট ২০২১ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনাসভায় বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– পিআইডি

প্রতিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিজয়ীদের হাতে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২১' প্রদান করেন।

এছাড়া এদিন বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের তিন সংস্থা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড আয়োজিত 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনাসভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান এবং তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. মকবুল হোসেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

চলচ্চিত্র wPiÄxe gyRe

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র *চিরঞ্জীব মুজিব*। এই চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের আগে এর সংলাপ, পরিমার্জন ও সংশোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর চিত্রনাট্য করেছেন নাট্যকার ও নির্মাতা জুয়েল মাহমুদ এবং নির্মাণ করেছেন নজরুল ইসলাম। প্রযোজক লিটন হায়দার। চলচ্চিত্রটি নিবেদন করছেন শেখ হাসিনা

ও শেখ রেহানাকে। এই চলচ্চিত্রে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত জনপ্রিয় নায়িকা পূর্ণিমা। এরই মধ্যে চলচ্চিত্রের শুটিংও শেষ। জানা গেছে, আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চলচ্চিত্র AvM÷ 1975

আগস্ট মাসেই ছাড়পত্র পেল বিশেষ চলচ্চিত্র *আগস্ট ১৯৭৫*। ১৫ই আগস্ট মুক্তি পায় ছবিটি। ১০ই আগস্ট বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড থেকে সিনেমাটি প্রদর্শনের জন্য বিনা কর্তনে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রযোজক সেলিম খান জানান, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সিনেবাজ অ্যাপে মুক্তি দেওয়া হয়েছে ছবিটি। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দর্শক সিনেমাটি দেখতে পারবেন এই অ্যাপের মাধ্যমে। *আগস্ট ১৯৭৫* সিনেমার কাহিনি ও চিত্রনাট্য করেছেন শামীম আহমেদ রনী। তিনি জানান, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেষ রাত থেকে ১৬ই আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মরদেহ দাফন পর্যন্ত কী ঘটেছিল– ইতিহাসের সেই নির্মম কাহিনির আলোকে এই সিনেমাটি নির্মাণ করা হয়েছে।

কলকাতার চলচ্চিত্র webmjZvq

২০শে আগস্ট মুক্তি পেয়েছে অতনু ঘোষ পরিচালিত *বিনিসুতোয়* ছবিটি, যেখানে অভিনয়ের পাশাপাশি প্লেব্যাকও করেছেন জয়া আহসান। ছবিতে তার কণ্ঠে শোনা যাবে রবিঠাকুরের কালজয়ী গান 'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি'। এই সংগীতায়োজন করেছেন দেবজ্যোতি মিশ্র।

বিনিসুতোয় ছবিতে জয়াকে দেখা যাবে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে ছুটে চলা শ্রাবণী বড়ুয়া নামের এক নারীর চরিত্রে। টেলিভিশনের এক রিয়েলিটি শোতে অডিশন দিতে যার সঙ্গে পরিচয় হয় কলকাতার কাজল সরকারের। যার সূত্র ধরে একসময় তাদের মধ্যে তৈরি হয় নতুন সম্পর্কের। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক, পরস্পরকে ঠিকমতো চিনতে পারার দক্ষতা বা ক্ষমতা ঠিক ছিল কি না– তা নিয়েই *বিনিসুতোয়* ছবির গল্প। এতে কাজলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রথম জয়ার বিপরীতে অভিনয় করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। অভিনয়ে আরও আছেন– কৌশিক সেন, খেয়া চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রতিবেদন: মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন মাদক ম্যাজিক মাশরুম

দেশের নতুন মাদকের নাম ম্যাজিক মাশরুম। সারা বিশ্বের মাদক সাম্রাজ্যে 'ম্যাজিক মাশরুম' এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক মাদক। এটি শরীরে ভয়ংকর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ম্যাজিক মাশরুমের উপাদানের মধ্যে সাইলোসাইবিন রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক দিয়ে তৈরি সাইলোসাইবিন হ্যালোসিনেশনের পাশাপাশি নানারকম ভ্রম তৈরি করে। এ মাদক যারা গ্রহণ করেন তারা নানা আত্মঘাতীমূলক কর্মকাণ্ড করেন। এমনকি তারা আত্মহত্যা পর্যন্ত করেন। সম্প্রতি র‍্যাব–১০ টিমের এক অভিযানে এই নতুন মাদক 'ম্যাজিক মাশরুম'-এর একটি চালান ধরা পড়ে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ম্যাজিক মাশরুম ভয়ংকর হ্যালোসিনেশন তৈরি করে। এটি এলএসডির চেয়েও ভয়ংকর। এ মাদক সেবন করলে মস্তিষ্কে ভ্রম তৈরি হয়। সেবনকারীর শরীরে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তখন মাদকসেবী নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এটি একটি ফার্মাসিউটিক্যাল ড্রাগ, যা নতুন আইনে যুক্ত হয়েছে। এই মাদক সেবনে মানসিক রোগ-সাইকোসিরেস, অনিদ্রা, অরুচি ও চোখ ফুলে যায়। মাত্র ৫ থেকে ১০ মি.গ্রা. সেবনে হ্যালোসিনেশন শুরু হয়। এর প্রতিক্রিয়া ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়

দেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার ৩০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাঁওতাল, উরাও, হেমরম সম্প্রদায়ের অসহায় গৃহহীন মানুষদের মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার গৃহ ও বাসস্থান প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বসতি এলাকায় খাস জমি ও বিত্তবানদের দেওয়া দানের জমিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ বরাদ্দের অর্থে এ সকল পাকা গৃহ নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি ঘর নির্মাণে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে সমাজের অবহেলিত দরিদ্র এই জনগোষ্ঠীর জীবনে ফিরে আসছে স্বাচ্ছন্দ্য।

সুবিধাভোগী লোখরু মারডি বলেন, নিজের কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। অন্যের জমিতে ঝুপড়ি বেঁধে জীবনযাপন করতাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিল্ডিং ঘর উপহার দিয়েছেন। এখন সুখেশান্তিতে বসবাস করছি। এজন্য শেখ হাসিনার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করছি দীর্ঘদিন দেশ ও মানুষের সেবা করুক। পঞ্চগড় জেলা আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সভাপতি শিবচরণ মারডি বলেন, বনজঙ্গল কমে যাওয়ায় অনেকেই এখন পেশা পরিবর্তন করছে, প্রাণী শিকারের পরিবর্তে এখন তারা কৃষিকাজসহ নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অনেকের নিজস্ব জমি ও ঘর নেই। শেখ হাসিনার সরকার তাদেরকে পাকাঘর নির্মাণ করে দিচ্ছে।

তিনি জানান, বোদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোলেমান আলী নিজেই ঘর নির্মাণ কাজের তদারকি করেছেন এবং ঘরের নির্মাণকাজ খুব ভালো হয়েছে।

বোদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোলেমান আলী বলেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যক গৃহহীন মানুষের আবাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গৃহ প্রদানসহ পুনর্বাসনের মাধ্যমে আর্থসামাজিকভাবে সচ্ছলতা এনে মূল স্রোতধারার সঙ্গে উন্নয়নে সমতা এনে দারিদ্র্যমুক্ত উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়ার সরকারের চলমান প্রয়াস।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

wkï I wK‡kvi Dbqb : we‡kl cwZ‡e`b

শিশু-কিশোরদের সার্বিক বিকাশে খেলাধুলার ভূমিকা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন বলেন, শিশু-কিশোরদের সার্বিক বিকাশে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন সুস্থ দেহ ও সজীব মন। এছাড়া খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, শৃঙ্খলাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, উদারতা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

প্রতিমন্ত্রী ১০ই জুন কুড়িগ্রাম জেলা স্টেডিয়াম মাঠে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর প্রেরণাদাত্রী সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)' ও 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)'- এর চূড়ান্ত খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের মধ্যে পদক ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই দুটি টুর্নামেন্টের মাধ্যমে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে নতুন প্রজন্ম জানবে এবং তাঁদের আদর্শ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হবে। পরে প্রতিমন্ত্রী টুর্নামেন্ট দুটির বিজয়ী ও বিজিত দলের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রথম রেজুলেশন

প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্বের শিকার বিশ্বের ১.১ বিলিয়ন মানুষকে ২০৩০ সালের মধ্যে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে ২৩শে জুলাই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় 'সকলের জন্য দৃষ্টি: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ' শীর্ষক দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রথম রেজুলেশন। 'ফ্রেন্ডস অব ভিশন'-এর পক্ষে রেজুলেশনটি উত্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। রেজুলেশনটি উত্থাপনের সময় বাংলাদেশের সাথে যোগ দেয় গ্রুপের সহ-সভাপতি এন্টিগুয়া ও বারবাডোস এবং আয়ারল্যান্ড। এতে সর্বমোট ১১৫টি দেশ সহ-পৃষ্ঠপোষকতা করে। রেজুলেশনটিতে সুদৃঢ় কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে যার মাধ্যমে কোটি কোটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের কাছে শক্তিশালী আশার বার্তা পৌঁছাতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, রেজুলেশনটি চক্ষু সেবার বৈশ্বিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। রেজুলেশনটিতে নেতৃত্ব দিতে পেরে বাংলাদেশ সম্মানিত বোধ করছে। তিনি বলেন, বিশ্বের ১.১ বিলিয়ন মানুষ অন্ধত্ব নিয়ে বসবাস করছে। প্রতিরোধযোগ্য এ দৃষ্টিহীনতা একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ যার জন্য প্রয়োজন একটি বৈশ্বিক সমাধান। এক্ষেত্রে আমাদের এই ঐক্যমত বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ, তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের জীবনধারায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা এবং অন্ধত্বজনিত কারণে মানুষের উৎপাদনশীলতা হারানোর ক্ষতির হিসাব অনুযায়ী, সারা বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৪১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়, যা একটি বিশাল বৈশ্বিক আর্থিক বোঝা। চক্ষু স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ শুধু শিক্ষা থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৪৪% হ্রাস করে না বরং এটি বেতনভুক্ত চাকরি পাবার সুযোগ ১০% বাড়িয়ে দেয়।

অন্ধত্বের ক্ষেত্রে ৫৫% নারী বা বালিকা; পুরুষদের তুলনায় তাদের অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ৮% বেশি।

রেজুলেশনটিতে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবাকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জাতীয় প্রতিশ্রুতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও দাতাদের লক্ষ্যভিত্তিক অর্থায়ন, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব মোকাবিলায় সহযোগিতা প্রদানের কথাও বলা হয়।

প্রতিবন্ধীদের জন্য আন্তর্জাতিকমানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তথা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আন্তর্জাতিকমানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার বলে জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল। ১২ই জুলাই পার্সনস উইথ সেরিব্রাল পালসি ফাউন্ডেশন (পিসিপিএফ) আয়োজিত 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে ভার্চুয়াল দাবা প্রতিযোগিতা ২০২১'-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভারে প্রতিবন্ধীদের জন্য তৈরি করা হবে অত্যাধুনিক ক্রীড়া কমপ্লেক্স– যাতে থাকছে দুটি বেইজমেন্টসহ ১১তলা একাডেমিক ভবন, ডরমেটরি, আবাসিক ভবন, জিমনেশিয়াম, সুইমিং পুল, মসজিদ, ফুটবল মাঠ, গ্যালারি ও ক্রিকেট মাঠ। এই ক্রীড়া কমপ্লেক্স তৈরি করা হলে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খেলাধুলার সুযোগ তৈরি হবে। এর মাধ্যমে তাদের সুস্থ বিনোদনের পথ তৈরি করা সম্ভব হবে। এছাড়া জাতীয় সংসদ ভবনের পাশের খোলা মাঠে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি দৃষ্টিনন্দন ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে কমপ্লেক্সের নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ভার্চুয়াল প্ল্যাটফরমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে পিসিপিএফ-এর সভাপতি শেখ এনায়েত করিমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউরো ডেভেলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. আনোয়ার উল্যাহ এবং বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক মাসুদুর রহমান মল্লিক।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়

বাংলাদেশ সফরে নাস্তানাবুদ হয়ে ৪–১ ব্যবধানে হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। মিরপুর শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ ৩রা আগস্ট থেকে ৯ই আগস্ট পর্যন্ত চলে। শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৬২ রানে অলআউট করে টাইগাররা। এটি টি-২০ তে অস্ট্রেলিয়ার করা সর্বনিম্ন রান। এর আগে ২০০৫ সালে তারা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৭৯ রানে অলআউট হয়। অবশ্য দুই ম্যাচ হাতে রেখেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-২০ সিরিজ জেতে বাংলাদেশ। ক্রিকেটের যে কোনো ফরম্যাটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এটি প্রথম সিরিজ জয় বাংলাদেশের। সিরিজ সেরা নির্বাচিত হন সাকিব আল হাসান।

টি-টোয়েন্টি র‍্যাংকিং: শীর্ষস্থানে সাকিব, সেরা দশে মুস্তাফিজ

দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা দুর্দান্ত কেটেছে বাংলাদেশের টাইগারদের। ঐতিহাসিক এই সিরিজ জয়ে সিরিজ সেরা হয়েছেন সাকিব আল হাসান। এর ফলে টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে ফিরলেন তিনি। ২০১৭ সালের পর প্রথমবার টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছেন সাকিব। যার ফলে আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবীকে হটিয়ে ক্রিকেটের এই ক্ষুদে সংস্করণে এখন এক নম্বর অলরাউন্ডার তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শেষ হওয়া সিরিজে বাংলাদেশ দলের আরেকজনও ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তিনি হলেন 'কাটার মাস্টার' মুস্তাফিজুর রহমান। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন তিনি। ওভারপ্রতি মাত্র ৩.৫২ রান দিয়ে ৮.৫৭ গড়ে ৭ উইকেট নেন এই বাঁহাতি পেসার। যার পুরস্কারস্বরূপ টি-টোয়েন্টি র‍্যাংকিংয়ে ২০ ধাপ এগিয়ে বোলারদের শীর্ষ দশে ঢুকে গেছেন মুস্তাফিজুর রহমানও। ২০১৮ সালের পর এই প্রথম টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ দশে জায়গা করে নিলেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ উদ্‌বোধনী দিনেই মাঠে নামবে বাংলাদেশ

ভারতের আয়োজনে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমানে। বিশ্বকাপের গ্রুপিং আগেই চূড়ান্ত হয়েছিল। ১৭ই আগস্ট সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদ্‌বোধনী দিনেই মাঠে নামবে বাংলাদেশ। আগামী ১৭ই অক্টোবর স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ অভিযান। প্রথম রাউন্ডে বাংলাদেশ তিনটি ম্যাচই খেলবে ওমানে। প্রথম রাউন্ডে 'বি' গ্রুপে বাংলাদেশের অন্য দুই প্রতিপক্ষ স্বাগতিক ওমান ও পাপুয়া নিউগিনি। ১৯শে অক্টোবর ওমান ও ২১শে অক্টোবর পাপুয়া নিউগিনির মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ওমান ক্রিকেট একাডেমি মাঠে মাহমুদউল্লাহদের প্রথম দুটি ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায়, তৃতীয়টি বিকাল ৪টায়।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন একাত্তরের গণহত্যার সাক্ষী বাংলাদেশের বন্ধু জোসেফ গ্যালোওয়ে

আফরোজা রুমা

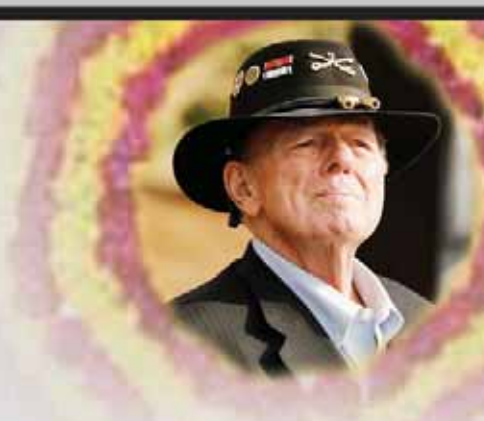

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতার সাক্ষী বাংলাদেশের বন্ধু খ্যাতিমান সাংবাদিক ও লেখক জোসেফ গ্যালোওয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ১৮ই আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার কনকর্ড সিটির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে যেভাবে মানুষ হত্যা করেছে, 'গণহত্যা' হিসেবে তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে কাজ করেছেন খ্যাতিমান সাংবাদিক জোসেফ গ্যালোওয়ে।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গ্যালোওয়ে দুই বার ঢাকায় এসেছিলেন। প্রথমবার জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে ডিসেম্বরে বাঙালির বিজয় অর্জন পর্যন্ত তিনি ঢাকায় ছিলেন।

২০১৬ সালের ২রা অক্টোবর নর্থ ক্যারোলিনায় প্রবাসীদের আয়োজনে এক অনুষ্ঠানে তিনি একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, ২৫শে মার্চ রাত থেকে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নৃশংসতা চালানোর পর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী দেখানোর চেষ্টা করে যে, দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। এজন্য ওরা কয়েকজন বিদেশি সাংবাদিক নিয়ে এক সফরের ব্যবস্থা করে। ওই সফরে থাকা গ্যালোওয়ে বলেছিলেন, তারা সাংবাদিকদের ছোটো একটি বিমানে দূর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু এলাকা দেখিয়ে বলে সর্বত্র স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। কিন্তু আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। এজন্য আমি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের আড়ালে চলে যাই, আশ্রয় নেই ঢাকার মার্কিন কনস্যুলেটে। ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড পাকিস্তানিদের নির্বিচারে গণহত্যার ঘটনায় তাঁর কাছে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন জানিয়ে গ্যালোওয়ে বলেন, মুক্তিকামী বাঙালির প্রতি সংবেদনশীল এই কূটনীতিক নিজের জীবন ও চাকরির ঝুঁকি নিয়ে কনস্যুলেট ভবনের একটি কক্ষ আমাকে ব্যবহারের অনুমতি দেন।

এরপর যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করে পাঠানোর কাজ শুরু করেন ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনালের (ইপিআই) রিপোর্টার গ্যালোওয়ে। কোনো সময় লুকিয়ে ঢাকাসহ আশপাশের এলাকা ঘুরে, কখনো কনস্যুলেটের কর্মচারীদের কাছ থেকে গণহত্যা, ধ্বংস, দুর্ভোগের তথ্য জেনে তা পাঠাতে থাকেন যুক্তরাষ্ট্রের দৈনিকগুলোয়। এরপর ফিরে আসেন যুক্তরাষ্ট্রে। কয়েক মাস পর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ যখন চূড়ান্ত পর্বে, সেই ডিসেম্বরে আবার ফিরেন ঢাকায়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের বিভিন্ন পর্যায়ের সাক্ষী মার্কিন এই সাংবাদিক।

শেষ সময়ে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালকে রেডক্রসের আওতায় নেওয়ায় সাংবাদিক গ্যালোওয়ে তার পরিচালনার দায়িত্ব নেন। সেখানে সামরিক বাহিনীর শেষ সংবাদ সম্মেলনে জেনারেল নিয়াজিকে তার সামরিক ব্যাজ ও অস্ত্র বাইরে রেখে ঢুকতে বাধ্য করেন। এ সময় ক্ষুব্ধ নিয়াজি তাঁকে গুলি করার হুমকিও দিয়েছিলেন বলে জানান গ্যালোওয়ে। ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালির অবিস্মরণীয় বিজয়ের পর রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী হত্যার স্থান পরিদর্শন করেন এবং এই নৃশংসতার সমালোচনা করে লেখেন এই সাংবাদিক। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ওপর তাঁর লেখা একটি বইয়ের গল্পে হলিউডে চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনালের ব্যুরো চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯১ সালে পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়েও রণাঙ্গনে ছিলেন জোসেফ গ্যালোওয়ে। তিনি ছিলেন যুদ্ধবিরোধী। তাঁকে মার্কিন সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ পদকে ভূষিত করেছিল। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সভাপতি রাশেদ আহমেদ এবং সেক্রেটারি রেজাউল বারি, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ড. খন্দকার মনসুর, সেক্রেটারি আবদুল কাদের মিয়া এবং কমিউনিকেশনস ডিরেক্টর লাবলু আনসার।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 03, August 2021, Tk. 25.00

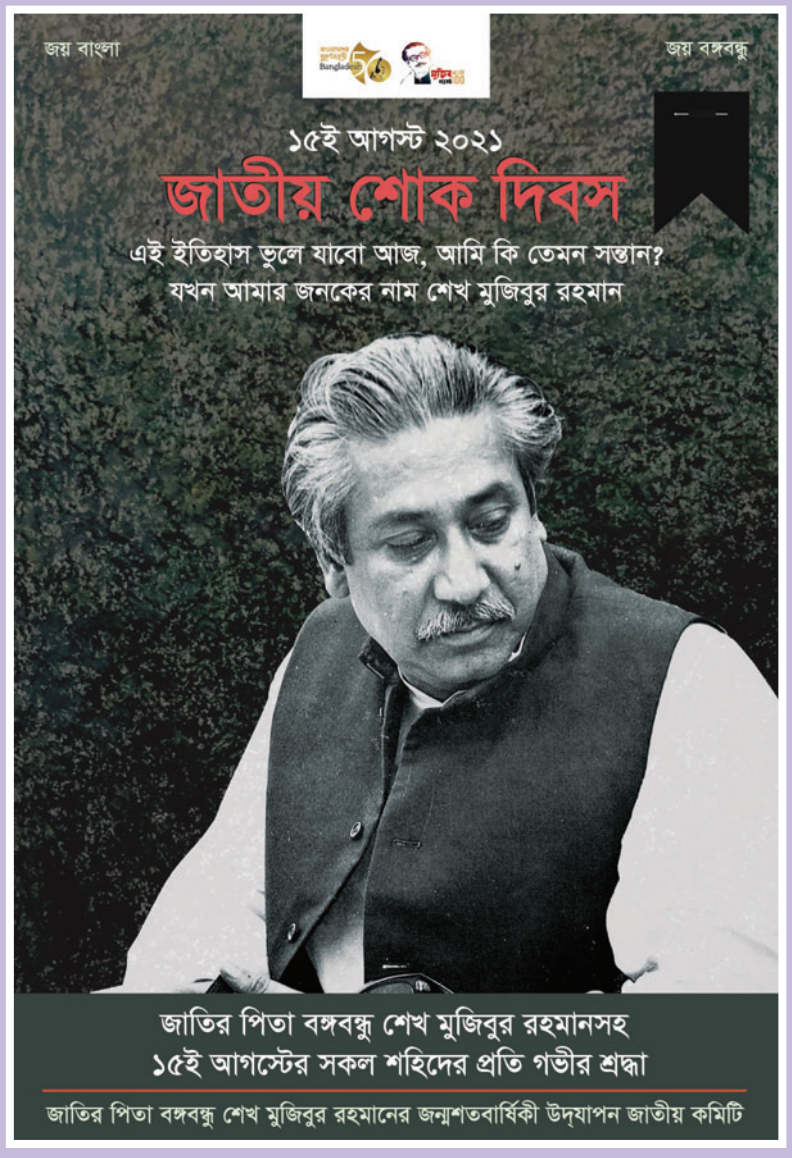

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd